একটি
THE BUSINESS STANDARD
প্রকাশনা

শুভ

০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ | সংখ্যা ১১০
SATURDAY 18 NOVEMBER, 2023

লিপস্টিক

শুধুই ঠোঁট রাঙানো!

জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন নিয়ে আর কত!

গৌতম মিত্র

একটা জিনিস লক্ষ করে দেখেছি, জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন বা কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কিছু লেখক বস্তাপচা, চর্বিতচর্বণ, জাবরকাটা মালমসলা ব্যবহার করেন।

কেন এত দৈন্যদশা? এগুলো প্রায় কমবেশি সবার মুখস্থ হয়ে গেছে। এগুলোকেই বারবার রিডিং দেওয়াটা কি খুব জরুরি? শুধু পারমুটেশন ও কম্বিনেশনের খেলা। আগে আর পরে। সেই অশোক মিত্র, গোপালচন্দ্র রায় বা সুবোধ রায়! নতুন কোনো দিশা নাই কারও লেখায়।

গত ৩ বছরে প্রায় ২ ডজন প্রবন্ধ পড়লাম বনলতা সেনকে নিয়ে, সব জায়গায় সেই থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড়। সেই 'কারুবাসনা'য় বনলতার উল্লেখ, সেই দেহোপজীবিনী তত্ত্ব, সেই নাটোরের রানি, দার্জিলিং মেল! ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত লাগে এগুলি পড়তে।

প্রাথমিকভাবে কিছু কাজ করেছিলেন ক্লিন্টন সিলি ও কল্যাণকুমার বসু। সেই ১৯৬৭-৬৮ সালে! তারপর ভূমেন্দ্র গুহ আর তাঁর সহযোগী হিসেবে এই অধম। ২০০০ থেকে ২০০৯! যাকে বলে গায়েগতরে খেটে।

প্লিজ, এগুলো লেখা থেকে বিরত থাকুন। কাগজের অপচয়, সময়ের অপচয়। অপরাধও। কাগজ ধ্বংস করবার অপরাধ। মণীন্দ্র গুপ্ত যেমন এই অপরাধ নিয়ে লিখেছিলেন।

বলছি না, সবাইকে ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হবে। আর বেরোলেই যে কিছু আবিষ্কার করা যাবে, তা-ও নয়। সারা পৃথিবীজুড়েই এই লেখা লেখা খেলা শেষ হয়ে গেছে। বাসি তথ্য কোথাও ব্যবহার করা হয় না। আমরা বাইরের যেকোনো একটা জীবনীর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি। জানি কাফকা বা ভার্জিনিয়া উলফের সম্প্রতি যে জীবনীটি প্রকাশিত হলো, তা আগের সবগুলো থেকে অন্য রকম। সময় নষ্ট করেন না তারা।

নিটশেকে নিয়ে হাইডেগার বা মালার্মেকে নিয়ে পল ভ্যালেরি বা অক্তাবিও পাজের মধ্যযুগীয় এক স্প্যানিশ কবিকে নিয়ে লেখা বইয়ের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, আমরা কী বিদ্যাসাগর, রামপ্রসাদ বা মধুসূদনের জীবনীগুলো ততটা লক্ষ করে দেখেছি।

টেক্সট মহাশয়, টেক্সট টেক্সট টেক্সট! টেক্সট-ই প্রকৃত প্রস্তাবে শেষ কথা। একবারও কী জীবনানন্দ দাশের টেক্সটগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন! এমনকি যারা বনলতা সেন নিয়ে প্রবন্ধ ফাঁদেন, তারা-ও!

লেখক কী লিখেছেন, তা তো সহজেই পড়া যায়; কিন্তু লেখক কী লেখেননি, তা কি কোনো দিন পড়বার চেষ্টা করেছেন! একটা লেখা মানে অনেক অনেক না-লেখাকে হত্যা করা। আমরা কি কোনো দিন ভেবেছি তা নিয়ে। আসলে মুষ্টিমেয় কজন বাদে 'টেক্সট' পড়তেই আমরা শিখিনি।

মরিস ব্লাঁশোর একটা প্যারাগ্রাফ পড়লে টের পাওয়া যায়, একটা লেখা আসলে কত না লেখার নির্যাস। 'মাল্যবান' বা 'ইউলিসিস'-এর ভেতর সময় কীভাবে সিঁধিয়ে আছে, তা কি কোনো দিন ভেবে দেখেছি।

এক লাইন লিখি, সামান্য লিখি, না লিখি কিংবা শুধু নিজের কথা লিখি। জাবর না কাটি। জাবরকাটা আসলে যার কাজ সেই কাটুক! ●

লেখক: জীবনানন্দ গবেষক

প্রচ্ছদ: মাহাতাব রশীদ

সাপ্তাহিক ইজেল, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর একটি প্রকাশনা, ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০। বিজ্ঞাপন: ০১৭১১৫৪৭০৫০ tbs.features@gmail.com tbsnews.net

গ্রাফিক্স: ইজেল

পাঁচ হাজার বছরের পথ পাড়ি

ওষ্ঠ রং করা থেকে লিপস্টিক

সৈয়দ মূসা রেজা

গুহাবাসী নারী হয়তো প্রথম অনুভব করতে পারে, জাম খেয়ে রঙিন হয়ে ওঠা তার অধরদ্বয়ের কারণে তার প্রতি গুহাবাসী মুষলধারী পুরুষের নজর ঘন ঘন পড়ছে! আর এ দেখেই হয়তো নারীরা ঠোঁট রাঙানোর তৎপরতায় মেতে ওঠে। এভাবে নানা রঞ্জক প্রয়োগে অধর রঙিন করে তোলার পথ ধরে আবিষ্কৃত হলো আধুনিক কালের ওষ্ঠরঞ্জক–লিপস্টিক। লিপস্টিকের ব্যবহার কীভাবে চালু হলো, সে কথা তুলে ধরেন মেগ রাগাস ও কারেন কোজলোস্কি। ১৯৯৮-এ প্রকাশিত বই 'রিড মাই লিপস: কালচারাল হিস্টোরি অব লিপস্টিক'-এ তুলে ধরা হয় এই কাহিনি।

স্ত্রীদের ঠোঁট রাঙানোর কাজে নৈতিকতার তর্ক তুলে কোনো বাধা দেয়নি সে যুগের স্বামীকুল। পাপ নয়; বরং একে স্ত্রীকুলের একধরনের দুষ্ট অবকাশ বিনোদন হিসেবেই মেনে নিয়েছেন তারা। সুন্দরী নারীর বর্ণনায় স্যার জন সাকলিং লেখেন, তার ওষ্ঠদ্বয় টকটকে লাল। এ রং প্রাকৃতিক নাকি প্রসাধনচর্চিত, তা নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি।

ওষ্ঠ রাঙানোর নল বা লিপস্টিক বিটির (বিফোর টিউব) কথা:

ঠোঁট রাঙানোর আদিমতম নমুনা বা প্রসাধনদানির আলামত পাওয়া গেছে, (ইরাকের) উরের কাছাকাছি পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো সুমেরীয় সমাধিতে। মিসরে ওষ্ঠ রাঙানোর প্রথার বিবরণ রয়েছে প্যাপিরাসের গোটানো পুঁথিতে। এতে মিসরীয় তরুণীর এক হাতে আয়না, অপর হাতে ঠোঁট রাঙানোর চিত্র আঁকা আছে। খ্রিষ্টীয় যুগের প্রথম দিকে নারী-পুরুষ উভয়ই ঠোঁট রাঙাত। এ ছাড়া প্রসাধন করা এবং ঠোঁট রাঙানোকে সে যুগের খ্রিষ্টান পত্নী নিজ নৈতিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে মান্য করত। পতির স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনায় এ প্রথা মানা হতো। চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক নারীরাও ঠোঁটে রং দিতেন। রঞ্জক প্রস্তুতে সিঁদুর, সাগর শৈবাল এবং মালবেরির মতো উদ্ভিজ্জাত উপাদান ব্যবহার করত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঠোঁট রাঙানোর রং পছন্দ করতে গিয়ে সাহসের পরিচয় দিতেন ফিলিস্তিনি দুহিতারা। উজ্জ্বল লাল-কমলা রং থেকে পর্যায়ক্রমে গাঢ় বেগুনি পর্যন্ত নানা বর্ণ ব্যবহার করতে দ্বিধা করত না ফিলিস্তিনি নারীরা।

মধ্যযুগে ঠোঁট রাঙানো দেখেই নারীর সামাজিক অবস্থান বোঝা যেত। ১৯০০ দশক পর্যন্ত এ ধারা চলেছে। ষষ্ট শতকে স্পেনে নিচু শ্রেণি এবং বারাঙ্গনারাই কেবল ঠোঁট রাঙাত। বিত্তশালী নারীরা উগ্র প্রসাধন থেকে দূরে থাকত। কিন্তু ১৩ শতকে এসে প্রথা এবং আচার-আচরণ পুরোই পাল্টে গেল। সর্বশ্রেণির নারী সে সময়ে ওষ্ঠ রাঙাতে শুরু করে। তুসকানের সমাজে বিত্তশালী নারীরা উজ্জ্বল গোলাপি রং ব্যবহার করত। অন্যেরা ব্যবহার করতে মেটে লাল রং। এ সময় ভরা বা বড় ধাঁচের মুখমণ্ডলের কদর ছিল। ফরাসি এক কবি টসটসে এবং লোহিত রঞ্জকের চেয়েও রক্তিমাভ অধরদ্বয়ের প্রশংসা করেছেন। চসারের দ্য কোর্ট অব লাভেও এমন অধরের প্রশংসাবাক্য রয়েছে। অধরকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার আয়োজনকে তুঙ্গে নিয়ে যায় জাপানি রমণীকুল। তারা প্রেমিকের নজর টানার জন্য নিচের ঠোঁটকে সোনালি রঙে রঞ্জিত করে তুলত। ইতালিতে রেনেসাঁ যুগে সৌন্দর্যের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করল মানুষ। 'সুন্দরী রমণী নিয়ে আলাপচারিতা' নামে বইটি লেখা হয় ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে। সে যুগের নামকরা লেখক ফায়ারেনজুওলার লেখা বইটিতে সুন্দর হওয়ার শর্ত হিসেবে মুখমণ্ডলকে ছোট হতে হবে বলে দাবি করা হয়। ওষ্ঠদ্বয়কে মধ্যম আকারের হতে হবে। থাকতে হবে লালের ছটা। হাসলে ওপরের পাটির ৫ থেকে ৬-এর বেশি দাঁত দেখা যাবে না। ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের যুগে লালচে ঠোঁটকেই প্রচলিত রেওয়াজ হিসেবে গণ্য করা হতো। (খোদ রানিরও পছন্দ ছিল আরবীয় আঠা, আন্ডার সাদা অংশ এবং ডুমুরের দুধসহযোগে এক জাতের কীট থেকে তৈরি লাল রঞ্জক।)

অন্যদিকে প্যারিসের রাস্তাঘাটে ঘুরতে গিয়ে নানদের রাঙানো ঠোঁট নজর এড়াত না। এ সময়ে প্রসাধন চল দিনে দিনে বাড়তে থাকে। কাজেই কাউকে না কাউকেই প্রসাধন বানানোর কাজে এগিয়ে আসা সে সময়ের একান্ত দাবি হয়ে ওঠে। কোনো কোনো প্রকাশনী সৌন্দর্যবর্ধক মিশ্রণ তৈরির প্রণালি এবং নির্দেশনা প্রকাশ করতে থাকে। লিপস্টিক বলতে আজকের দিনে যে জিনিস দেখতে পাই, তার গণ-উৎপাদন ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের আগে শুরু হয়নি। লিপস্টিকের ধাতব নলটির আবিষ্কারক মার্কিন মরিস লেভি। এরপরের কয়েক দশক ধরে ঠোঁট রাঙানোর নতুন নতুন সৌন্দর্য মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি বের হতেই থাকে।

সপ্তদশ শতকে এসে পুরোহিত এবং নীতিবাগীশদের সমালোচনার মুখে পড়ে ওষ্ঠ রাঙানোর প্রসাধন তৎপরতা। তাদের বক্তব্য, এভাবে রং মেখে ঈশ্বরের সবচেয়ে দামি উপহারের প্রকৃতি বদলে দেওয়া হচ্ছে। সমালোচনার তোড়ে থেমে বা দমে যায়নি অধর রাঙানোর প্রক্রিয়া। 'চেরির মতো টকটকে লাল ওষ্ঠদ্বয়'কে সেকালে 'সৌন্দর্যের মাপকাঠি' হিসেবে ধরা হতো। সে 'মাপকাঠি' অর্জনে রমণীকুলের চেষ্টাকে এসব সমালোচনা স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। 'নিজ স্ত্রী বেছে নেবেন কীভাবে' নামের অজ্ঞাতনামা লেখকের বইতে এই মাপকাঠির কথা বলা হয়েছে। কবি রবার্ট হেররিকের ভাষায়, (পছন্দের রমণীর অধরদ্বয় হতে হবে) 'রুবির মতো টকটকে লাল।'

স্ত্রীদের ঠোঁট রাঙানোর কাজে নৈতিকতার তর্ক তুলে কোনো বাধা দেয়নি সে যুগের স্বামীকুল। পাপ নয়; বরং একে স্ত্রীকুলের একধরনের দুষ্ট অবকাশ বিনোদন হিসেবেই মেনে নিয়েছেন তারা। সুন্দরী নারীর বর্ণনায় স্যার জন সাকলিং লেখেন, তার ওষ্ঠদ্বয় টকটকে লাল। এ রং প্রাকৃতিক নাকি প্রসাধনচর্চিত, তা নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি।

শয়তানের ' লেবেঞ্চুষ!'

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ঠোঁটে রং দেওয়ার প্রবণতাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য প্রথা হিসেবে মেনে নিল সমাজ। তবে এর বিরুদ্ধবাদীরাও তখন একেবারে মিইয়ে যায়নি, তৎপর ছিল। ইংরেজ ধর্মযাজক এবং লেখক টমাস হল ১৬৫৩-এ 'দ্য লোথসামনেস অব লং হেয়ার' নামের পুস্তকে প্রসাধনীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। রং লাগানোকে তিনি শয়তানের কর্ম বলে দাবি করে। ঠোঁটে তুলির আঁচড় দেয় যেসব রমণী, তারা অন্যকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াসে মাতে বলেও অভিযোগ তোলেন এ ধর্মযাজক। প্রচণ্ড অহংবোধের তাড়নায় এমন তৎপরতায় নামে, বিশ্বাস ব্যক্ত করে তিনি।

প্রলুব্ধ করার কাজে লিপস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রথম হয়তো মুখ খোলেন টমাস হল। কিন্তু প্রলুব্ধ করার সরঞ্জাম হিসেবে লিপস্টিক ব্যবহারের ধারণাটি বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। লিপস্টিক ব্যবহার করে পুরুষকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে প্ররোচিত করলে কোনো নারীর বিরুদ্ধে ডাইনিতন্ত্র প্রয়োগের অভিযোগ আনা যেতে পারে। কোনো ধর্মযাজক নয় বরং ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সংসদ এমন আইন প্রণয়ন করে। ভেটিং বা ভাব বিনিময়কে বিবাহের পথে পরিচালিত করতে প্রসাধনীর আশ্রয় নেওয়া হলে পরিণামে সে বিয়ে বাতিল করা হতে পারে। এমন আইন করা হয় পেনসিলভানিয়ায়। এমনকি ১৯৯৬-এ মালয়েশিয়ার সরকার কুয়ালালামপুরে লিপস্টিকের অতিরিক্ত প্রয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এতে বলা হয় যে, এ কর্মের ফলে অবৈধ যৌনতার পথে ধাবিত হওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।

কড়া প্রসাধনী

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে দরবারের নারীরা কড়া প্রসাধনী ব্যবহার করত। তাদের চেহারা 'নকশা আঁকা চিনামাটির পাত্রে'র রূপ নিত। অন্যদিকে সেকালের নগরবধূরা প্রসাধন প্রয়োগের বেলায় যত দূর সম্ভব স্বাভাবিকতা বজায় রাখার চেষ্টায়ই করত। এদিকে লন্ডনে 'সান্ধ্যরমণীকুল' ঠোঁট রাঙাতে কার্পণ্য করত না। স্যার হেনরি বিউমন্ট ইংরেজ ললনার ঠোঁটের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রাণবন্ত লালিমার উল্লেখ করে। লালিমার এ ছোপ বিধিদত্ত নয়, অর্জন করতে হতো। ব্র্যান্ডি দিয়ে ঠোঁট প্রক্ষালনসহ গোলাপের রং এবং নানাবিধ উপাদান প্রয়োগের দরকার হতো। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, ফরাসি নারীরা বছরে প্রায় ২০ লাখ পাত্র রুজ মাখত।

থিতিয়ে যাওয়ার দিনগুলো

রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন জেঁকে বসার দিনগুলোতে ওষ্ঠ রঞ্জনে প্রকাশ্য ভাটার টান লাগে। উনিশ শতকের বেশির ভাগ সময়জুড়েই প্রসাধনীর কড়া ব্যবহার সমাজ মেনে নেয়নি। ওষ্ঠ রঞ্জনপ্রক্রিয়ার ওপর প্রকাশ্য বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু অন্দরমহলে মহিলাদের সৌন্দর্যচর্চার ধারাবাহিকতায় এর গুরুত্ব বজায়ই রইল। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে অভিজাত শ্রেণি বা সুবিধাভোগী শ্রেণির হাতে গোনা কিছু পরিবার প্যারিস থেকে গেরলাইনের তৈরি ঠোঁট রঞ্জক মলম বা পমেট কেনার সুবিধা পেত। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে গেরলাইন প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সফল ওষ্ঠরঞ্জক বিপণন করে। জাম্বুরাজাতীয় ফলের নির্যাসের সাথে মাখন এবং মোম মিশিয়ে তৈরি করা হয় এই রঞ্জক মলম। এদিকে বিধিনিষেধে জর্জরিত ভিক্টোরিয়া শাসনাধীন নারীকুলও ঠোঁট রাঙাবার নতুন পথ পেয়ে যায়। গোলাপি রঙের মোড়কের কাগজ বা ক্রেপ পেপার ঠোঁটে ঘষে অধরদ্বয়কে রাঙিয়ে তোলে তারা।

ওষ্ঠ রঞ্জন নিয়ে বাদানুবাদ চলার মধ্যেই প্রসাধন নির্মাণ এবং বিতরণ তৎপরতাও বাড়তে থাকে। রঞ্জনপ্রক্রিয়ার বিরোধিতাকারীদের দুটো দল ছিল। একদল নারীস্বাস্থ্যের কথা ভেবে রঞ্জকে ব্যবহৃত সিসা বা এই জাতীয় উপাদানের স্বাস্থ্যহানিকর দিকের ওপর জোর দিত। এসব ঠোঁটের নরম ত্বকের প্রকৃতি বদলে দিত। ঠোঁট খরখরে হয়ে যেত। চুমো দেওয়ার পর অনেক শিশুই সে রকম নারীর উদ্দেশে বলে উঠত, তোমার ঠোঁট খুব রুক্ষ, কাঁটার মতো মনে খোঁচা দিচ্ছে! অন্য দল মনে করত, এভাবে রঞ্জক ব্যবহার করে নারী তার সম্পর্কে ভুল ভাবমূর্তিই কেবল তুলে ধরে।

পরিবর্তনের হাওয়া

১৮৬০-এর দশকে এসে প্রসাধন এবং ঠোঁট রাঙানো নিয়ে সাবেক ভাবনাগুলোর চিরবিদায় ঘটে। এ সময়ে জার্মান কিশোরী চার্লেস মেয়ার চালু করেন নাটকের কাজে ব্যবহার যোগ্য প্রসাধন, ঠোঁটের ক্রেয়ন। এ ছাড়া ফরাসিরা ঠোঁটরঞ্জক রাখার জন্য প্রসাধনকক্ষে যে তাক বসানোর কথা বলছিল, তা-ও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হতে থাকে। এ আহ্বান জানানো হয়েছিল ১৮৩৯-এ প্রকাশিত 'দ্য টয়লেট: এ ড্রেসিং টেবিল কম্প্যানিয়ন' নামের বইতে। ঠোঁটকে রাঙিয়ে তুলতে যাদের দ্বিধা ছিল, তারা এবার নীরবে সব সংশয়ের ইতি টানলেন।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিপুল পরিমাণে প্রসাধনসামগ্রীর তালিকা প্রকাশ করে সিয়ার্স রোবুক। এতে চিবুক এবং ঠোঁট রাঙানোর উপাদানের বিবরণ দিয়ে বলা হয়, এগুলো মোটেও ক্ষতিকারক নয়। সে সময় উপাদানের দাম ছিল ৫০ সেন্ট। চলতি বছরের হিসাবে এর দাম ১৮.৫৪ ডলার দাঁড়াবে বলেই জানাল ইন্টারনেট। এ হিসাবে বলা হয়েছে, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ১ ডলারের ক্রয়ক্ষমতা ছিল চলতি বাজারদর অনুযায়ী ৩৭.০৮ ডলারের সমপরিমাণ।

ওষ্ঠ রঞ্জকের বিশ্ব বিজয়

সব দিন সমান যায় না। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ঠোঁট রাঙানো বা প্রসাধনীর প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণ করা শুরু হলো। প্রযুক্তির বিকাশ, সৃজনশীল বিপণন ধারা এবং বিজ্ঞাপনের মনোলোভা কলাকৌশলের গুণে প্রসাধনের জগৎ তুঙ্গে উঠে গেল। প্রাচীন মিসরের পর এই প্রথম প্রসাধনকে সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সর্বজনীনভাবে মেনে নেওয়া হলো। ১৯০০ দশকে প্রকাশিত এক কাউন্টেসের 'সৌন্দর্য' গ্রন্থে ঠোঁট স্ট্রবেরির মতো লাল হবে বলে বর্ণনা করা হলো। তবে এ বর্ণ-বিভূতি কোনো রঞ্জক ব্যবহার করে নয়। বরং নীরোগ জীবনব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে। লালিমা ফুটিয়ে তুলতে বা টসটসে করতে ঠোঁটে হালকাভাবে কামড়ানো বা এলাচির গরম আরক পানের চল ছিল। এ বইতে সেসব অভ্যাসের বিরোধিতাই করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে ঠোঁট রাঙানোর বদলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। ১৯০৪-এ ভোগ সাময়িকীতে ওষ্ঠে ব্যবহারের সুগন্ধির বিষয়টি তুলে ধরা হয়। দাবি করা হলো, ০.২৫ ডলার মূল্যের উপাদান ঠোঁটদ্বয়কে কেবল দেখতে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করে তুলবে না, বরং ঠোঁটকে খসখসে হওয়ার হাত থেকেও রক্ষা করবে।

সৌন্দর্য-পণ্যের বাণিজ্য রমরমা হতে শুরু করে ১৯০০ দশকের সূচনায়। জনমনে লিপস্টিক ধীরে ধীরে নিজ আসন গেড়ে বসতে থাকে একই সাথে। জনচাহিদা মেটাতে নিজেই লিপস্টিক এবং রুজ বাজারে ছাড়েন হেলেনা রুবিনস্টাইন। প্রথম বিউটি পার্লার খুললেন এলিজাবেথ আর্ডেন। এতে দেওয়া হতে থাকে হেয়ার ড্রেসিং থেকে শুরু করে প্রসাধন পর্যন্ত নানা সৌন্দর্যসেবা। নিজ নিজ সৌন্দর্যশিল্প খাতে এদের মতোই আরও অনেকেই নেতৃত্ব দেওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। সৌন্দর্যের আদব-লেহাজ বা শিষ্টাচারবিষয়ক এক লেখক জানালেন যে হালকা খাবারের পর খাবার টেবিলেই বসে প্রকাশ্য ঠোঁটে রং বোলানো যাবে। তবে ভোজসভায় এটি গ্রহণীয় হবে না। এ সময়ে নারীদের হাতব্যাগে জায়গা করে নেওয়ার উপযোগী ওষ্ঠ রাঙানোর উপাদান, ভ্রু আঁকার পেন্সিল, পাউডার পাফসহ প্রসাধন উপকরণ থাকত।

১৯০০ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রসাধন পণ্যের বিক্রি ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এভরিবডিজ ম্যাগাজিন জানায়, ১৯১৫ সালে এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই দেড় কোটি ডলার মূল্যের প্রসাধন উপকরণ বিক্রি হয়েছে। কোনো কোনো প্রসাধনী উপকরণে বিষাক্ত উপাদান থাকত। তারপরও বিক্রির কমতি ছিল না। এর মধ্যে লিপস্টিকেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক উপাদান থাকত। এভরিবডিজ সাময়িকী আরও জানায়, এসবের নির্মাতা ছিল পুরুষ। নারী খদ্দেরদের কাছে বিষাক্ত পণ্য বিক্রি করার এবং তাদের ধোঁকা দেওয়া বন্ধের কোনো আইন তখনো ছিল না। মার্কিন কংগ্রেস ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফেডারেল খাদ্য, ওষুধ এবং প্রসাধন বিধি অনুমোদন করে। উল্লেখযোগ্য এ আইনে পণ্যের নিরাপত্তা ও মান নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়।

চলচ্চিত্রে লবকুশীদের ব্যবহার উপযোগী প্রসাধনী ১৯১৪-এ প্রথম তৈরি করে ম্যাক্স ফ্যাক্টর। বলা হয়, এই প্রসাধনী দিয়ে লিপস্টিকের বিরুদ্ধে মার্কিনদের আগের ধারণা বদলে দিতে সহায়তা করে অভিনেত্রীরা। ১৯২৮-এ ম্যাক্স ফ্যাক্টরই তৈরি করে লিপ গ্লস। এটি বানানো হয়েছিল চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীদের লক্ষ্য রেখে। তবে লিপস্টিকে ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখার জন্য ঠোঁট জিব দিয়ে হালকাভাবে চাটার বা ভেজানোর দরকার পড়ত। লিপ গ্লস আসার পর সে তাগিদ আর রইল না।

১৯২৩-এ এসে উদ্ভাবনী পন্থায় একই বাক্সে বন্দী করা হলো রুজ, পাউডার ও লিপস্টিককে। আর এসবই করা হলো অল্প পরিসরে। ফলে ক্রেতাদের টানা গেল। ক্রেতাকে অধিক হারে টানা মানেই হলো উৎপাদনের খরচা কমে যাওয়া। একই সাথে দামও কমল প্রসাধনীর। দাম কমার পেছনে আরেকটা কারণ হলো, এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চেইন শপের আবির্ভাব ঘটে। লিপস্টিক ব্যবহারকে কেবল ভালো বলেই মেনে নেওয়াই হলো না; বরং জাঁকালো গণপ্রথার রূপও নিল তা। ১৯২৪-এর মধ্যে, আন্দাজ করা হয়, ৫ কোটি মার্কিন ললনা লিপস্টিক ব্যবহার করছেন। বিজ্ঞাপন ব্যয়ে খাদ্য কোম্পানির পরই জায়গা করে নিল প্রসাধন নির্মাতারা।

১৯২০ দশকের মাঝামাঝি বাজারে এল অমোচনীয় লিপস্টিক। প্যারিসের কোম্পানি লেসকোন্দিউ 'তুসি' নামে অনপনেয় লিপস্টিক ছাড়ল। এতে আরও যোগ করা হলো খোশবু। ইংল্যান্ড এ পদ্ধতির সাথে তাল মেলাতে চেষ্টা করল। লন্ডনভিত্তিক প্রাইমরোজ হাউস 'যথার্থ অনপেনেয়' লিপস্টিকের বিজ্ঞাপন দিল। কিন্তু সত্যিকার অমোচনীয় লিপস্টিক ১৯৪০-এর আগে

লাল আভার ওষ্ঠরঞ্জক

আন্দালিব রাশদী

আগাথা ক্রিস্টির সেই বিশ্বখ্যাত ছোটখাটো গড়নের বিশেষ গোঁফধারী বেলজিয়ান ডিটেকটিভ এরকুল পোয়ারো নারীর ফ্যাশন জগৎ সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানবান। কোন নারীর চরিত্রের সাথে কোন রঙের আভার লিপস্টিক জুতসই হবে, তিনি বেশ বলে দিতে পারেন। আবার লিপস্টিকের রঙের আভা বিবেচনায় নিয়ে শনাক্ত করতে পারেন গুরুতর অপরাধটি সংঘটিত করেছে কোন লিপস্টিকধারী। খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসের অর্ধেক পেরিয়ে যাবার পর যখন জানা গেল, ভিকটিম কখনো লিপস্টিক পরতেন না–কাহিনির হঠাৎ বাক্‌বদল ঘটল, এসে গেল এক লিপস্টিক ক্লু। সত্যজিৎ রায়ের মহানগরের নায়িকা লিপস্টিক লাগিয়েই অফিস করেন; কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে ভালো করে ঠোঁট মুছে নেন, যেন তার রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারটি হঠাৎ তার ওপর চটে না যায়। 'লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরকা' নামে একটি সিনেমা হয়েছে, এ নিয়ে বিতর্কও হয়েছে।

গ্রাফিক্স: ইজেল

বাজারে আসেনি। এখানেও ট্রু-কালার নামে লিপস্টিক ছেড়ে বাজার মাত করল ম্যাক্স ফ্যাক্টর। এটি কেবল দীর্ঘস্থায়ীই নয়, বরং লাগানোর পর ঠোঁট চুলকায় না। রংও বদলায় না। থাকেও দীর্ঘ সময়।

১৯২৯-এ ম্যাক্স ফ্যাক্টর নিয়ে এল লিপ ব্রাশ। জরিপের ভিত্তিতে কোম্পানি জানতে পেল যে ফ্যাশন-সচেতন মার্কিন নারীর অন্তত দুটি লিপস্টিক রয়েছে। একটি দিনের জন্য, অন্যটি সন্ধ্যার পরে ব্যবহারের জন্য। ১৯৩০-এ এক বিজ্ঞাপনী সংস্থা হিসাব দিল, মার্কিন নারীরা প্রতিবছর তিন হাজার মাইল লিপস্টিক ব্যবহার করে। ১৯৩৩-এ ভোগ বলল, লিপস্টিক হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসাধন উপকরণ।

ক্যাস্টার অয়েল এবং পেট্রলজাত জেলি দুর্লভ হয়ে ওঠায় লিপস্টিক উৎপাদনের সামান্য হলেও বিপত্তি ঘটাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ সময়ে রেভলনের রসায়নবিদ শুনতে পেল টেনিসাসের একটি গুদামভর্তি ক্যাস্টর অয়েল রয়েছে। পুরো গুদামের সব তেল কেনার আগে ৪০টি গ্যালনের প্রতিটি খুলে চেখে দেখলেন তিনি। এতে ফিরতি পথের পুরো সময় তাকে টয়লেটেই কাটাতে হয়েছে।

যুদ্ধের সময় নৈতিক মনোবল ধরে রাখার কাজে লিপস্টিকের গুরুত্বের কথা বুঝতে পারে রেভলন এবং ফ্যাশন সাময়িকী ভোগ। যুদ্ধের প্রয়োজনকে সামনে রেখে ধাতব নল বাদ দিতে হলো। এর বদলে লিপস্টিকের জন্য প্রথমে ব্যবহার করা হলো প্লাস্টিক, পরে কাগজ। বাকি কোম্পানিও একই পথে হাঁটা শুরু করল। এদিকে জার্মানিতে প্রসাধনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন হিটলার। সাথে সাথে জার্মান ললনারা কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করল।

মহাযুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে লিপস্টিকের প্রতি ললনাকুলের টান আরও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। নারীর আকর্ষণকে পুঁজি করে লন্ডনের গালা ১৯৪৮-এ চালু করে লিপ লাইন। ফুরিয়ে গেলে আবার ভর্তি করার ব্যবস্থা ছিল নানা বর্ণের এই লিপ লাইন। রিমেল নিয়ে এল লিপ প্যালেট। এতে দেওয়া হতো আয়না ও ব্রাশ। গায়া নিয়ে এল প্রচলিত লিপস্টিকের চেয়েও দ্বিগুণ বড় গ্র্যান্ডি নামের লিপস্টিক। এলিজাবেথ অর্ডেনের সারপ্রাইজ লিপস্টিক আটলান্টিকের উভয় পারের নারীদের মন–সত্যিকার অর্থে ঠোঁট জয় করল।

চলছে চলবে

১৯৫৭ সালে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গামী তরুণীদের ওপর এক জরিপে উঠে আসে যে ৯৯.৭ শতাংশই লিপস্টিক ব্যবহার করছে। এর আগে ১৯৫২ সালে রেভলন ফায়ার অ্যান্ড আইস নামে বিজ্ঞাপনী অভিযান শুরু করে। এটাই ছিল সে যুগে প্রসাধনীর সর্ববৃহৎ বিজ্ঞাপনী অভিযান। ১৯৫৮-এ টাইম সাময়িকীতে ম্যাক্স ফ্যাক্টর বলল, খামারে কাজ না করলে লিপস্টিকহীন যেকোনো নারী জনসমক্ষে নিজেকে বিবস্ত্র হিসেবে অনুভব করে।

লিপস্টিক না দেওয়া মানে সমাজচ্যুত হওয়া–এমন এক ধারণারও সৃষ্টি হলো। এদিকে মনাকোর রাজপুত্র রাইনিয়েরারে সাথে হলিউডের গ্রেস ক্যালি বা রাজপুত্র আলি খানের সাথে রিটা হেওয়ার্থের মতো রাজকীয় বিয়ে প্রসাধন চর্চার প্রতি রমণীকুলের ঝোঁক আরও বাড়িয়ে তুলল। ১৯৫৩ সালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেকের সময় ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের নারীদের কাছে রানির অভিষেকে গোলাপি রং জনপ্রিয়তা পেল। সময়োপযোগী লিপস্টিক তৈরির জন্য প্রসাধনী কোম্পানিগুলো ফ্যাশন ডিজাইনারদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখল। এ পালে জোর হাওয়া দিল ভোগ সাময়িকী। প্রতি ঋতুর উপযোগী রং তুলে ধরে সাময়িকীটি এর উপযুক্ত রং মিলিয়ে প্রসাধনী তৈরির জন্য কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানাতে থাকল।

এ দশকের মাঝামাঝি এসে পাশার দান আবার উল্টে গেল। চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীরা পাশের বাসার মেয়েটির মতো সহজ-সরল এবং সাদামাটা হতে থাকল। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হতে চাইল। বেছে নিতে শুরু করল প্রায় পাণ্ডুর ওষ্ঠদ্বয়। ১৯৫৭-এর কুইনস সাময়িকীতে জোয়ান প্রাইস নির্দেশনা দিলেন, লিপস্টিককে কড়াভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে না।

এক বছরের মাথায় ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ফের ফিরে এল উজ্জ্বল লিপস্টিক। ভোগও বলল, লিপস্টিক হতে হবে যথার্থ লাল, কমলা, গোলাপি-কমলা। ম্যাক্স ফ্যাক্টর তৈরি করা শুরু করল গোলাপি ও কমলার উজ্জ্বল নজরকাড়া রঙের লিপস্টিক। কমলাও নয়, গোলাপিও নয়; ম্যাক্স ফ্যাক্টরের অতি উজ্জ্বল বর্ণবিভূতির মোহে বন্দী হয়ে গেল গোটা প্যারিস। হেলেনা রুবিস্টাইন আনল সব সময়ে ব্যবহারযোগ্য লিপস্টিক বেড অব রোজেজ। গালা তার প্রসাধনীতে টাইটানিয়াম ব্যবহার শুরু করে। মানুষ সত্যিই চকচকে এবং সাদাটে ঠোঁটের ভক্ত বনে যায়। এতে একটি নারীসুলভ স্পর্শ ছিল। এই ধারা পরবর্তী দশককেও মোহিত করে রাখে।

১৯৬০-এর দশকে লিপস্টিকের প্রতি আরও খোলামেলা মনোভাব গড়ে ওঠে। ১৯৫০-এর দশকের চিত্রকলার স্টাইলে ওষ্ঠ রাঙানোর নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এ ধারায় উদ্দীপ্ত 'তারুণ্যের-কম্পন'বা 'ইউথকোয়াক' বয়ে যায় লন্ডনে। ফ্যাশনজগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মেরি কোয়ান্ট মিনি স্কার্ট প্রবর্তন করেন। উঁচু বুট এবং তারুণ্যের বর্ণচ্ছটায় ভরপুর প্রসাধনীও নিয়ে আসেন তিনি। ১৯৬৬ সালে এসে গালার জন্য নিজস্ব প্রসাধনী ধারাকে চালু করেন তিনি। নিজ স্মৃতিকথায় তিনি বলেন, ফ্যাশনের পুরোনো কালের প্রসাধনের দিন ফুরিয়ে গেছে। লিপস্টিককে হতে হবে সাবটেল এবং গ্লোসি।

'নিজের মতো চলো' ফ্যাশন ধারাবাহিকতার পথ ধরে লিপস্টিক লাগানোর প্রবণতায় বিপ্লব ঘটে যায়। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ব্রিজিত বার্দ্রো, জিন শ্রিম্পটন ও টুইগি নিজেদের তুলে ধরলেন নাটকীয়ভাবে লাগানো লিপস্টিকের মাধ্যমে। ১৯৬৪-এ জেমস বন্ডের গোল্ডফিঙ্গার চলচ্চিত্রের প্রভাবে লিপস্টিকে ধাতব ছোঁয়া লাগল। এ সময় সোনা, ব্রোঞ্জ এবং রুপাভিত্তিক লিপস্টিক বাজারে ছাড়ল হেলেনা রুবিনস্টাইন। এদিকে ইংল্যান্ডে এ সময় অভ্যুদয় ঘটল চেলসি কন্যাদের। ফ্যাশনজগৎকে সাহসিক প্রান্তে ঠেলে দিল তারা। ঐতিহ্যগত শৈলীর সীমানাকে অতিক্রমও করতে দ্বিধা ছিল না তাদের। তাদের ঠোঁটে উঠল সাদা লিপস্টিক। লিপস্টিক নিয়ে এ পর্যন্ত সব ভাবনা এবং চিন্তাকে দূরে ঠেলে দিল তারা।

১৯৭০-এর পুরো দশক ধরেই এ চল বজায় থাকল। চিত্রাঙ্কনের নানা প্রযুক্তিকে পরীক্ষা করে দেখতে দ্বিধা করল না নারীরা। চোখের রঙের সাথে বা পোশাকের সাথে মিল রেখে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাল তারা। রেভলন সময়ের সাথে পাল্লা দিতেই আনল সাদাটে ধরনের লিপস্টিক। ১৭ শেডে ভরপুর এসব লিপস্টিকের স্ট্রিং অব পার্লর্স, স্যামন আইস এবং জিনজার গ্লেয়ের মতো নামকরণ করা হলো। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে কালো লিপস্টিকও জনপ্রিয়তা পায়। নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী পাংক আন্দোলন এই লিপস্টিককে জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

আকর্ষণীয় রমণীর সেরা প্রশংসা হিসেবে সুশ্রী এবং সুন্দরী শব্দদ্বয়ের বদলে ব্যবহৃত হবে উত্তেজনাপূর্ণ। হারপারস বাজারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বলেন ফ্যাশন সাংবাদিক ইউজেনিয়া শেফার্ড। তিনি আরও বলেন, উত্তেজনা মানে আরও হবে আন্দোলন, গোলযোগ, অশান্তি এবং আজকের চেতনা।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে লিপস্টিক নিয়ে বিপরীতধর্মী আন্দোলন চলে। প্রথমে সাহসী প্রসাধনী এবং টসটসে ওষ্ঠের প্রকাশ ঘটানোর দিকে মন দেওয়া হয়। কিন্তু দশকের শেষে ঠোঁট রাঙানোর ধারাবাহিকতা তার বৃত্ত পূর্ণ করে। আবার ফিরে আসে স্বাভাবিকতার দিকে।

৯০-এর দশকের এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে নীল, রুপালি, সোনালি ও হলুদ লিপস্টিকের দেখা মেলে। বাজারে আসে দীর্ঘ সময় ঠোঁটে টিকে থাকার মতো লিপস্টিক।

হারপারস বাজারের সৌন্দর্য এবং ফ্যাশন পরিচালক অ্যানেমারি আইভারসনের মনে করেন, লিপস্টিক ব্যবহার নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। ব্যবহারেও এসেছে নমনীয়তা। একক ধারা অনুসরণের যুগ ফুরিয়ে গেছে। লিপস্টিক লাগানোর ক্ষেত্রে এসেছে বৈচিত্র্য। নারী যা পছন্দ করবে, তা-ই পরবে। নতুন সহস্রাব্দ উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে লিপস্টিক এমনই এক যুগে চলে এসেছে। এখানে নিখুঁত বলে কোনো কিছু নেই বা এমন কোনো সংজ্ঞা নেই। কেবল ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং নিজস্বশৈলী এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে, বাকি সব গৌণ। পশ্চিমের লিপস্টিকের নানা বিবর্তনের সঙ্গী হয়েছে এ অঞ্চলের নারীরাও। বিংশশতক ও একবিংশে তো লিপস্টিক নারীর সাজের অতি অপরিহার্য অনুসঙ্গই। ●

গ্রাফিক্স: ইজেল

লাল লিপস্টিকের নারীকে অন্ধকারের সমাজ অঙ্কশায়িনী করলেও দিনের বেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে–সেই লাল লিপস্টিকই আবার নারীর জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারে অংশগ্রহণের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্ণ প্রকাশিত হয়েছে লাল লিপস্টিকের মাধ্যমে। নারীর জন্য লিপস্টিক একটি সাংস্কৃতিক চিহ্ন: নারীর সেক্সুয়ালিটি, সেনস্যুয়ালিটি, ফেমিনিনিটি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মনে করা হয়েছে লিপস্টিককে। বঙ্গীয় বিবেচনায় 'এফ' শব্দের মতো কিছু অশ্লীল পঙক্তি থাকলেও স্পিড গ্যাংয়ের রেড লিপস্টিক গানটা উপেক্ষা করার উপায় নেই। শরীরী যোগাযোগ নেই প্রেমিক রাস্তায়, যোগাযোগ কেবলই ফোনে। কাতর অনুরোধ।

But I am on the road on
I am never home Baby,
kiss the phone with red lipstick.

ফোনটাতে লাল লিপস্টিকের চুম্বন লাগিয়ে দাও।

কলঙ্কিনীর ভূষণ

রাতের আধারে গ্রিক এলিটরা যাদের শয্যাসঙ্গ লাভ করে পরম তৃপ্তি পেতেন, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই তাদের বলতেন কলঙ্কিনী। এই বাংলাতেও তা-ই এবং এখনো সেই চর্চা বহাল রয়েছে।

প্রাচীন গ্রিসে লিপস্টিক মাখানো ঠোঁটের নারীকে এককথায় বারবনিতার সিল মেরে দেওয়া হতো। এটাও সত্যিই সেকালের বারবনিতার (বাণিজ্যিক যৌনকর্মী শব্দটি মাত্র কয়েক দশকের পুরোনো) সাজসজ্জার অন্যতম উপাদান ছিল ওষ্ঠ বিরঞ্জক লিপস্টিক। একটি সাধারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, পৃথিবীর ৫৫ ভাগ কৈশোরোত্তীর্ণ নারী লিপস্টিক ব্যবহার করে থাকে। প্রাচীন মিসরে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। সেখানে নারীর পাশাপাশি পুরুষও ওষ্ঠ রাঙাতে পছন্দ করত। তাদের প্রিয় রঙের আভা ছিল ম্যাজেন্টা, লালচে কালো এবং লাল। রোমান সাম্রাজ্যেও নারী-পুরুষ উভয়ই ঠোঁট রাঙানোর প্রসাধন ব্যবহার করত। ফলে নারী-পুরুষের পার্থক্য নির্ধারণ নয়, বরং তা ব্যবহারকারীর সামাজিক শ্রেণি নির্ধারণ করত। গরিব রোমানদের ঠোঁট রেড ওয়াইননির্ভর হয়ে ওঠে। এই লালচে ধরনটা বেশি সময় টিকে থাকত না, তুলনামূলকভাবে এটা কম বিষাক্ত হতো–ফলে বরং তাকে গরিব শ্রেণিতেই পড়তে হতো। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় মণিমুক্তোর গুঁড়ো মিশিয়ে বিরঞ্জকের গুরুত্ব বাড়ানো হতো।

লিপস্টিকের অ্যাগজিস্টেনশিয়াল ক্রাইসিস

অস্তিত্বের সংকটের চেয়ে ভয়ংকর কিছু নেই। অস্তিত্বসংকট ডাইনোসরকেও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীতে পরিণত করেছে। সেই সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল লিপস্টিক বিশ্বব্যাধি কোভিড-১৯ পৃথিবীকে গ্রাস করে নেয়। ঠোঁট যদি মুখোশে ঢাকাই পড়ে থাকে, তাহলে লিপস্টিক লাগানোর কী দরকার? বাধ্যতামূলক মুখোশ পরা যদি অব্যাহত থাকত, লিপস্টিক ইন্ডাস্ট্রির লালবাতি জ্বলা ঘনিয়ে আসত। কটি অনুমিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, একজন সাধারণ আমেরিকান

লিপস্টিকে অং সান সু চি।

নারী একজীবনে ১৭৮০ ডলারের লিপস্টিক কিনে থাকেন। মুখোশ বহাল যখন চলতে থাকে, নেলপালিশ বিক্রি বেড়ে যায়। সেই সাথে বিক্রি বাড়ে চক্ষুসজ্জার সরঞ্জামের। আই শ্যাডো ও নেইল ভার্নিশ কিছুটা ঘাটতি মেটালেও এসব কখনো লিপস্টিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি।

'লিপস্টিক আন্ডার মাই মাস্ক' বলে কেউ কেউ বিশ্বব্যাধিকালে জানান দিয়েছেন, তারা লিপস্টিক ছাড়েননি। তবুও খবর বেরিয়েছে, লিপস্টিক ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হবার পথে। কিংবা লিপস্টিক কারখানায় তালা ঝুলছে কিংবা লিপস্টিক কারিগর এখন ম্যাচিং মুখোশ তৈরির কারখানায় যোগ দিয়েছে। লিপস্টিক থাকবে তো? এ প্রশ্ন আর ধ্বনিত হচ্ছে না, অস্তিত্বের সংকট কেটে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে এবার আশ্বস্ত করতে হবে–নাক-মুখ ঢেকে রাখার মতো প্যান্ডেমিক বা বিশ্বব্যাধি আর যেন না আসে।

লিপস্টিক-মৃত্যু

৩ নভেম্বর ১৯৩০। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের ম্যারাথন কাউন্টি নরমাল স্কুলের মিস ওথেলা উইঙ্গার কাছাকাছি বাবার বাড়িতে একটি পার্টিতে যাবার প্রস্তুতি নিলেন, লিপস্টিকে ঠোঁট রাঙালেন।

হঠাৎ মনে হলো, তার ঠোঁট জ্বলে যাচ্ছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে এবং অসহ্য হয়ে উঠছে। জ্বালাপোড়া থুতনি ও গলায় নেমে এসেছে, সাথে যন্ত্রণাও। দ্রুত ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো। ডাক্তার দেখলেন ঠোঁট, চিবুক ও গলা ফুলে গেছে, মুখে ঘা দেখা দিয়েছে এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর জ্বর। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। ডাক্তার সমস্যা শনাক্ত করতে পারলেন না। দুদিন পর ওথেলা উইঙ্গার মারা যায়।

মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে বোর্ড বসে। প্যাথলজিস্ট তার লিপস্টিক পরীক্ষা করেন। মিস উইঙ্গার এমন একটি পেপার ম্যাচ লিপস্টিক ব্যবহার করেছেন, যা বাজার পায়নি, তখন বাজারে ছিলও না। ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু পেপার ম্যাচ লিপস্টিক একসময় বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। মিস উইঙ্গার প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করবেন বলে রেখে দিয়েছিলেন। এটা কেমন ছিল অনুমান করতে পারেন–বড় আকৃতির একটি ম্যাচ বক্সে গোটা দশেক ম্যাচের কাঠি–কাঠির অগ্রভাগে লিপস্টিক। কিন্তু জমিয়ে রাখা এই প্যাকেটের পেপার ম্যাচ লিপস্টিকে একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব ও সংক্রমণ ঘটে। এতেই রোগ শনাক্ত করার আগেই তার মৃত্যু ঘটে। পরে এ ধরনের লিপস্টিক বাজার থেকে পুরোপুরি উঠিয়ে নেওয়া হয়।

মায়ের লিপস্টিক–প্রেমিকার লিপস্টিক

লিপস্টিকের একটি ঘাতক উপাদান সিসা। মাকে ভালোবেসে চুমু খেতে গিয়ে লিপস্টিক লেপ্টে দিল বলে শিশুটির পিঠে দু-চার ঘা পড়তে পারে, কিন্তু তার চেয়ে ভয়ংকর কিছুও ঘটেছে–ফ্যাশনদুরস্ত মা তা হয়তো বিবেচনাতেই আনছেন না।

শিশুটি লেড পয়জন–সিসাজাত বিষও যে একই সঙ্গে ভক্ষণ করল। শুধু শিশুর নয়, কিছু সিসাবিষ মাও তো ভক্ষণ করে চলেছে। সিসা থেকে উদ্ভূত নিউট্রোক্সিন শিশুর ভাষা শেখা ও পড়াশোনা করাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তবে সব লিপস্টিকেই সিসা আছে, এমন নয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় দেখা গেছে, সেখানকার নারীরা দিনে ২ থেকে ১৪ বার ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে ৮৭ মিলিগ্রাম লিপস্টিক তাদের শরীর শোষণ করে থাকে। লাল ও গাঢ় রঙের লিপস্টিকে সবচেয়ে বেশি মাত্রার সিসা ও অন্য ধাতব থেকে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অন্তত নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঠোঁটের ওপর লিপস্টিকপ্রতিরোধক একটি বেস ব্যবহার করে তার ওপর লিপস্টিক প্রয়োগ ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

ন্যুড লিপস্টিক না রেড লিপস্টিক

ন্যুড লিপস্টিক শুনে অকারণ উত্তেজনার প্রয়োজন নেই, ক্ষুব্ধ হওয়ার নয়। ন্যুড লিপস্টিকের সাথে নগ্নতার সম্পর্ক নেই। ন্যুড লিপস্টিকের রং ও আভা ব্যবহারকারীর ঠোঁটের রঙের সবচেয়ে কাছাকাছি–ঠোঁটের ন্যাচারাল কালার যে লিপস্টিকে প্রতিফলিত, সেটাই ন্যুড লিপস্টিক। এই ধরনের লিপস্টিকের প্রতি আগ্রহ কোনো কোনো নারীর পঞ্চাশের দশকেও ছিল, কিন্তু নব্বইয়ের দশকে এসে হঠাৎ এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। অনেক নারীর কসমেটিক ব্যাগেই দু-একটি স্টিক জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। বাদামি থেকে গোলাপি অনেক ধরনেরই হয়ে থাকে। কেনার সময় আয়নায় নিজের ঠোঁট একবার দেখে লিপস্টিক মিলিয়ে নিলেই হলো। নব্বইয়ের দশকে নারীদের একাংশেরও মনে হয়েছে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের হারিয়ে দিতে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকতে থাকতে তাদের ফেমিনিনিটি (নারীত্ব) হারিয়ে যাচ্ছে। ন্যুড লিপস্টিক তাদের স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরিয়ে দিচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রে নারীকে তার 'স্কিন টোন' ভালো করে জানতে ও বুঝতে হবে। ফর্সা স্কিন টোনের জন্য গোলাপি আভার লিপস্টিক–যেমন 'ওহ মাই গুয়াভা' মাখার স্কিন টোনের জন্য 'নটি' কিংবা 'চাই লাভ ইউ' আর গাঢ় ত্বকের জন্য 'বার্সেলোনা' বা 'ওহ লা লা' লিপস্টিকের ব্যবস্থাপত্র কোনো কোনো প্রসাধন বিশেষজ্ঞ দিয়ে থাকেন। ২০২৩-এর বসন্তে সাধারণ ঠোঁটধারীর আগ্রহ বেড়েছে 'বাবলগাম পিচ' 'প্যাস্টেল পার্পল' এবং 'মিউটেড পিচ' রঙের প্রতি। এ সময় কোভিডকালের বিবর্ণ দশা কাটাতে সামনে এসেছে 'ব্রাইট অ্যান্ড বোল্ড'। আওয়াজ উঠেছে: বোল্ডার ডার্কার বেটার। বেগুনি রং ফিরে এসেছে ডেয়ারিং পার্পল হিসেবে।

রেড লিপস্টিক আন্দোলন ও নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় বিংশ শতকের শুরুতে মিলেমিশে যায়। মার্কিন মেকআপ শিল্পের উদ্যোক্তা এলিজাবেথ আর্ডেন ১৯১২ সালে ১৫ হাজার আন্দোলনকারীকে 'রেড ডোর বেড' লিপস্টিক টিউব উপহার দেন এবং তারা ঠোঁট লাল করে নিউইয়র্কের রাস্তায় মার্চ করেন এবং ভোটাধিকারের দাবি জানান।

লাল লিপস্টিক আন্দোলন

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫–দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের 'ম্যাসকিউলিন কোড অব পাওয়ার' গুঁড়িয়ে দিতে বিদ্রোহী নারীরা লাল লিপস্টিক ধারণ করেন। জার্মান নাৎসি প্রধান অ্যাডলফ হিটলার লাল লিপস্টিক ভয়ংকর অপছন্দ করতেন। সুতরাং হিটলারের বিরুদ্ধে নারীর যুগপৎ দেশপ্রেম এবং নারীত্ব প্রকাশের প্রতীক হিসেবে তারা লাল লিপস্টিকই ধারণ করলেন। ফেমিনিজম আন্দোলনে থার্ড ওয়েভ–তৃতীয় ঢেউ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় লিপস্টিক ফেমিনিজম। ফেমিনিজমের দ্বিতীয় ঢেউ আন্দোলন হিসেবে পাশ্চাত্যে ১৯৬০-এর দশকে বিরাজ করেছে–এই ঢেউ আমেরিকার তথা ইউরোপের সৌন্দর্যশিল্পকে চ্যালেঞ্জ করেছে, অনেক নারীত্বজ্ঞাপন পোশাক ও সাজগোজ প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ব্রেসিয়ার, ফলস আইল্যাশ, নারী ম্যাগাজিন। তারা অসনাতন পোশাক ও লোমবহুল পা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। উলস্টোনক্র্যাফটের যুগে নারীর রূপ দেখানো প্রবণতা প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানানো হয়েছে। সিমন দ্য বুভেয়ার নারীকে তার শরীরের বাইরে নিয়ে আসতে চেয়েছেন, নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তিতে উত্থিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরানিয়ান-আমেরিকান লেখক আজাদেহ মোয়াভেনির 'লিপস্টিক জিহাদ' এক তরুণীর জীবনসংগ্রামের কাহিনি।

লিপস্টিক ও বাররনিতাবৃত্তির সম্পর্কতত্ত্ব ১৯২০-এর দশকেই বর্জিত। এলিজাবেথ আর্ডেনের লাল লিপস্টিক প্রণোদনা আন্দোলনে গতি এনেছে। ১৪৫৩ সালে লাল লিপস্টিককে নারী সেক্সুয়ালিটির সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়েছে। মেরিলিন মনরোর লাল লিপস্টিককেও ধরে নেওয়া হয়েছে আন্দোলনেরই অংশ। ২০১৭-এ নারীর আন্দোলন 'আই অ্যাম হোয়াট আই মেকআপ'। নতুন সহস্রাব্দে হলিউডের সিনেমা লিপস্টিক ফেমিনিজমকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে এসেছে। লাল লিপস্টিক শুধু নারীর ঠোঁটের লালবর্ণ নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে তার স্বাধীনতার আন্দোলন–প্রত্যাশার বিশ্ব।

বলা হয়ে থাকে, কিশোরীর ঠোঁটে লাল লিপস্টিক লাগিয়ে দাও, সে বিশ্ব জয় করবে।

শিল্পী সাব্রিনা কার্পেন্টার লিপস্টিক ভালোবাসেন; কিন্তু তাকে প্রচুর গান গাইতে হয়, ফলে মাইক্রোফোনে লিপস্টিকের অনেকটাই লেপ্টে যায়, কাজেই তিনি কদাচিৎ ওটা লাগিয়ে থাকতেন।

শার্লট টিলবারির কথা দিয়ে শেষ করা যায়: প্রত্যেক নারীরই একজন পুরুষ পাবার অধিকার রয়েছে; যে তার ঠোঁটের লিপস্টিকের বারোটা বাজাবে, কিন্তু মাশকারার নয়।

গ্রাফিক্স: ইজেল

বিজ্ঞাপনে লিপস্টিক

লাভ আর লাভ!

আমিল বতুল

প্রসাধনজগতে লিপস্টিকের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা রয়েছে। ললনারা কেবল যে একে পছন্দ করে, সেটাই একমাত্র কারণ নয়। বরং প্রসাধন নির্মাতাদের বিজ্ঞাপনের চতুর ব্যবহারও কিশোরী থেকে বয়সী পর্যন্ত প্রায় সব বয়সী নারীকে ঠোঁট রাঙানোর শিল্পে মেতে ওঠায় ব্যাপক অবদান রেখেছে। ১৮০০ দশকের শেষের দিকের বাণিজ্যজগতে সিয়ার্স রোবাকের মতো মর্যাদাপূর্ণ ক্যাটালগগুলোতে স্থান করে নেয় লিপস্টিক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরই বিপণনের রণকৌশল নিয়ে বাজার দখলে নামে ওষ্ঠ রাঙানোর এই প্রসাধনী। মহাযুদ্ধ ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত বিশ্বে সৌন্দর্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। উদয় হতে থাকে ফ্যাশন সাময়িকীর। জার্মানি, ফ্রান্স ও মার্কিন কলকারখানা রণ-পণ্য উৎপাদন বন্ধ করে প্রসাধনসহ শান্তি সময়েরপণ্য নির্মাণের দিকে ঝুঁকতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন পুরুষের অনেক ভূমিকাই পালন করেছে নারী। এর মধ্য দিয়ে আত্মবলে বিকশিত এবং বলীয়ান হয়ে ওঠে নারী। যুদ্ধ শেষে রণফেরত সেনাদের সাথে চাকরির প্রতিযোগিতায় নামে নারীও। এ ক্ষেত্রে নারীর এক অনবদ্য হাতিয়ার হয়ে ওঠে লিপস্টিক। লিপস্টিক লাগিয়ে নারী চাকরির বাজারে নিজের উপস্থিতির সরব ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে পুরুষদের তুলনায় সুবিধাও করে নেয়।

ওষ্ঠের প্রতি নজর টানার জন্য এ সময়ে নারী বেছে নেয় লাল লিপস্টিক। এক ঐতিহাসিকের পর্যবেক্ষণ, অতীতের নারীকুলের থেকে তারা আলাদা এটি ফুটিয়ে তুলতে রুজ, লিপস্টিক, পাউডার এবং নেইল পালিশের মতো প্রসাধনীকে অবলম্বন করে তারা। একই সাথে এ-ও তুলে ধরে যে পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় নারীই সে।

বিজ্ঞাপনদাতারা বহু আগে থেকেই নিজ পণ্য বিক্রির ধারণা পাওয়ার জন্য তাকাত হলিউডের দিকে। অভিনেত্রীরা অনেক আগে থেকেই লিপস্টিক ব্যবহার করতেন। চলচ্চিত্র তারকারা প্রসাধনপণ্যের সম্মানীয় মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকের বিজ্ঞাপনগুলোতে পণ্যকে প্রকাশ করার বদলে তা হয়ে ওঠে আবেদনময়ীদের পোস্টার। ১৯৩০-এর দশকে জিন হারলো এবং ক্লারা বোর মতো তারকারা তাদের নতুন চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার সময়ে ম্যাক্স ফ্যাক্টরের লিপস্টিক বিক্রি করতেন। এদিকে বিজ্ঞাপনগুলোর বক্তব্যে বলা হতো, এ পণ্য ব্যবহারে দেখাবে তরুণ এবং ন্যাচারাল। প্রসাধন বিক্রির একই কৌশল আজও চলছে।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সেভেন্টিজ কসমেটিকস রমণীকুলকে প্রলুব্ধ করতে স্লোগান সৃষ্টি করল, রাতারাতি সপ্তদশী তরুণী বনে যান! বি সেভেন্টিজ টুনাইট! তারুণ্যের রঙে ভরা লিপস্টিকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ভুয়া রং থেকে আলাদা হবে এটি। হবে গুণে-মানে উন্নত। ঠোঁটকে করবে নরম, স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ। কোনো পুরুষ এমন নারীর ন্যাচারাল ওষ্ঠে চুমো খাওয়ার আবেদনকে উপেক্ষা করতেই পারবে না। এমন দাবিও করা হলো। গুয়ারলিন বিজ্ঞাপনকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিল। তারা দাবি করল, আপনার স্বপ্নের লিপস্টিক। তাদের এ গালভরা বুলির বিক্রয় কৌশল ও ধারা ভবিষ্যৎকালের সংস্থাগুলোও গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি।

কিছু কিছু বিজ্ঞাপনদাতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামাজিক পরিবর্তনকে তাদের প্রসাধন পণ্যের বিজ্ঞাপনে তুলে এনেছে। টাঙ্গির বিজ্ঞাপন বলা হলো–'লড়াই, নারী এবং লিপস্টিক'। রণ-তৎপরতায় নারীর অবদানকে স্বীকার করে বলা হলো, পুরুষের দায়িত্ব পালনের সময়েও নারীত্বকে বজায় রাখাই হলো গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার প্রতীক। এ কথা সত্য যে লিপস্টিক দিয়ে যুদ্ধ জয় হবে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা প্রতীককে রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

যুদ্ধের এই মহা ডামাডোলের মধ্যেও প্রসাধনপণ্যের চাহিদা জোরালো হয়ে ওঠে। ১৯৪১-এ নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে

এদিকে ফ্রান্স তোলপাড় করে তোলে একটি প্রসাধন কোম্পানি। ১৯৫২ সালে 'আ স্ট্রিটকার নেমড ডিজায়ার' নামের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয় প্যারিসে। কোম্পানিটিও একই নামের লিপস্টিক বাজারে ছাড়ে। একই সময়ে প্যারিসের চারপাশে পুরোনো আমলের গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় একদল সুন্দর তরুণীকে। তাদের সবারই ছিল মনকাড়া রঙের লিপস্টিক।

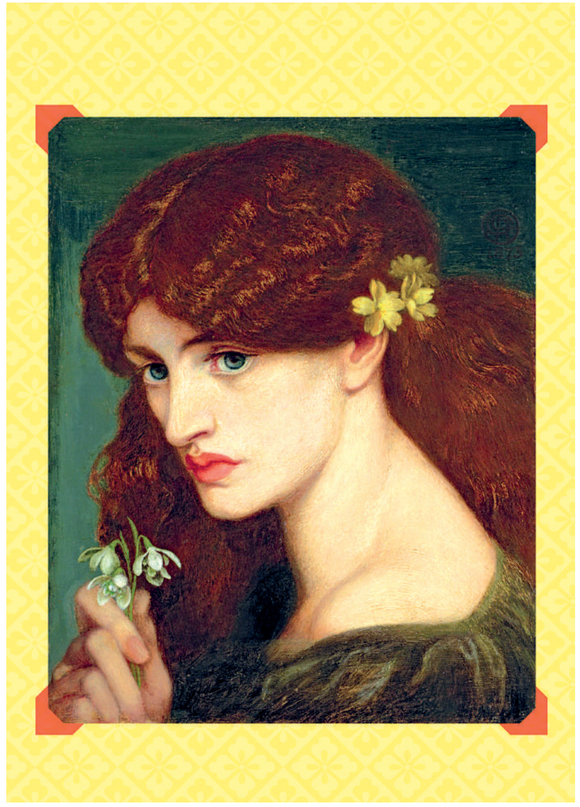

উঠে আসে, মার্কিন নারীরা লিপস্টিক খাতে ব্যয় করে বছরে ২ কোটি ডলার। (সে সময় ১ ডলারের ক্রয়ক্ষমতা ছিল আজকের দিনের হিসাবে ২০.৯৪। এ অনুযায়ী ২০২৩-এর হিসাবে এ অর্থের পরিমাণ হবে ৪১ কোটি ৮৮ লাখ ডলার।) নির্মাতারা তাদের আয়ের ২০ শতাংশ বিজ্ঞাপন খাতে ঢেলে দিত। গ্ল্যামার এবং রোমান্স ছিল তাদের বিজ্ঞাপনের মূল সুর। যুদ্ধকালীন এ সুর পাল্টে ফেলে। যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত নারীকে সেরা রূপে দেখানোর ওপর জোর দেয় প্রসাধন সংস্থাগুলো। নারী যুদ্ধকর্মীর প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয় রোজি দ্য রিভেটারকে। শ্রমিকের ডেনিম পোশাক পরিহিত রোজির কোমরে আঁটা ছিল টুল বেল্ট। কিন্তু ঠোঁটদ্বয় রাঙানো হয় লিপস্টিকে।

লড়াইয়ের রক্তাক্ত দিনগুলোতে প্রসাধনী চর্চার হার কমেনি। বরং কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বাড়ে ৬৫ শতাংশ। প্রসাধনী বিশেষ করে লিপস্টিকের অনেকে প্রয়োজনীয় উপাদান দুর্লভ হওয়া সত্ত্বেও এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ভবিষ্যতে এ প্রবৃদ্ধির হার আরও বেগবান হবে বলেই আভাস পাওয়া যায়। লিপস্টিকের এ কুচকাওয়াজে রেভলন কদম মেলায় ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। সস্তায় ফ্যাশনপণ্য বিক্রির সূচনা করে এ কোম্পানি। একটি লিপস্টিকের চেয়ে বেশি খরচ পড়বে না—এমনি হিসাব করে গণ-ফ্যাশন বিক্রির পরিকল্পনা নিয়ে নামে রেভলন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ হাজার টন লিপস্টিক কিনতে মার্কিন জনগণ খরচ করেছে প্রায় ৩ কোটি ডলার। অধুনালুপ্ত লাইফ সাময়িকীর হিসাবে, এ বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ৭৭ বছর ধরে বেতন দেওয়া যেত।

১৯৪০-এ ট্রু-কালার লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনে এল রেইন এবং ম্যাডলিন ক্যারলের মতো খ্যাতিমান হলিউড তারকাদের সম্পৃক্ত করে ম্যাক্স ফ্যাক্টর। এতে জনগণের উদ্দীপনাকে আরও উসকে দেওয়া হয়। কোম্পানিটি দাবি করে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বা ধকলের পর্যায়ে পার হওয়ার পরও তাদের লিপস্টিকের বর্ণ থাকছে অক্ষুণ্ন। ১৯৪৫-এ রেভলন নিয়ে এল ফ্যাটালে আপেল বিজ্ঞাপন অভিযান। এ বিজ্ঞাপনে ইভের ভূমিকায় রইলেন ডোরিয়ান লেই। বাইবেলে বর্ণিত আদম-হাওয়া উপাখ্যানকে নিজেদের মতো করে এতে প্রচার করা হলো। দাবি করা হলো, অ্যাডামের প্রতি ইভ চোখ টেপার পর এই প্রথম তারচেয়েও হৃদয়হরণকারী লোভনীয় রং নিয়ে এসেছে রেভলনের লিপস্টিক। ডেট্রয়েটে নতুন গাড়ির প্রবর্তনে মার্কিন পুরুষকুল সেকালে উত্তেজনা অনুভব করতেন। একই উত্তেজনা মার্কিন নারীদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটানো রেভলন প্রতিবছর দুবার করে ম্যাচিং লিপস্টিক এবং নেইলপালিশের বিজ্ঞাপন প্রচার করে এ কাজটি করল তারা। বিজ্ঞাপন অভিযানের নিরলস তৎপরতায় মার্কিন ঘরে ঘরে লিপস্টিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর সকল কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউকে। সে যুগে নিউইয়র্কের খ্যাতিমান বিজ্ঞাপন এবং বিপণন সংস্থাগুলোর দপ্তর ছিল এখানেই। সেকালের এক জরিপে দেখা গেল, ৯৮ শতাংশ নারী নিয়মিত লিপস্টিক মাখেন। কিন্তু নিয়মিত দাঁত মাজেন ৯৬ শতাংশ!

বিজ্ঞাপনের ভঙ্গিময় পরিবর্তন আনা হলো। ভাষা এবং ঢংয়ের দিকে থেকে ফ্যাশন সাময়িকীতে ছাপানো সম্পাদকীয় বা ফিচারের মতো হয়ে উঠল। ম্যাক্স ফ্যাক্টর স্বর্ণকেশী, বাদামি এবং শ্যামাঙ্গিনী নারীকে লক্ষ্য করে টকটকে লাল রঙের লিপস্টিক তৈরি করল। এলিজাবেথ টেলরকে এর মডেলের ভূমিকায় রাখা হলো। হেজেল বিশপ নামের নতুন লিপস্টিকে বিজ্ঞাপন বাবদ রেমন্ড স্পেক্টর খরচ করল ১৫ লাখ ডলার। দীর্ঘ সময় এ রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি।

কিন্তু ১৯৫২ সালে লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনে বিশাল ব্যয়ের রেকর্ড গড়ল রেভলন। ফায়ার অ্যান্ড আইস ছাড়ল বাজারে। এখন পর্যন্ত এ প্রসাধন খাতের সবচেয়ে সফল হিসেবে ফায়ার অ্যান্ড আইসের বিজ্ঞাপনকেই ধরা হয়। এ বিজ্ঞাপনের মডেল ছিলেন ডোরিয়ান লেই। বিজ্ঞাপনে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি ফায়ার অ্যান্ড আইস ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত? তারপর পনেরোটি প্রশ্নে জুড়ে দিয়ে বলা হয়, এর মধ্যে যদি আটটির উত্তর হ্যাঁ সূচক হয়, তাহলে আপনি ফায়ার অ্যান্ড আইস ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। এতে চুমো খাওয়ার সময় চোখ বন্ধ করেন কি না বা আপনার রূপের গুণগান গাইলে লাজ-রাঙা হয়ে ওঠেন কি না—এই জাতীয় প্রশ্নও ছিল।

বছরের সেরা হিসেবে ভোট জয় করে এ বিজ্ঞাপন। এরই জোরে লাল লিপস্টিক আগের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একই সাথে ফায়ার অ্যান্ড আইসও রেভলনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রঙের স্থান অর্জন করে নেয়।

এদিকে ফ্রান্স তোলপাড় করে তোলে একটি প্রসাধন কোম্পানি। ১৯৫২ সালে 'আ স্ট্রিটকার নেমড ডিজায়ার' নামের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয় প্যারিসে। কোম্পানিটিও একই নামের লিপস্টিক বাজারে ছাড়ে। একই সময়ে প্যারিসের চারপাশে পুরোনো আমলের গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় একদল সুন্দর তরুণীকে। তাদের সবারই ছিল মনকাড়া রঙের লিপস্টিক।

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে বাজারে লিপস্টিক ছাড়তে থাকে অনেক কোম্পানি। একটা ঠাসাঠাসি অবস্থা দেখা দেয় প্রায়। তবে এক কোম্পানির তৈরি লিপস্টিককে অন্য কোম্পানির একই পণ্য থেকে পৃথক করাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় প্রায় ৪৮টি নানা ব্র্যান্ডের লিপস্টিক পাওয়া যেত। এ সময়ে কোম্পানিগুলো নিজ নিজ পণ্যকে ভিড়ের মধ্য থেকে আলাদা করার জন্যও উঠেপড়ে লাগে। রেভলন নিয়ে আসে ল্যানোলাইট লিপস্টিক। রাতে ঠোঁটে লাগিয়ে ঘুমাতে গেলে সকালে সৌন্দর্যমণ্ডিত ওষ্ঠ নিয়ে ওঠা যাবে। অর্থাৎ এ লিপস্টিক এতটাই স্থায়ী হবে। লাভ দ্যাট পিংক নামের আরেক লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনে রেভলন বলল যে লাজুক বা ফিসফিস করা গোলাপি বর্ণ নয়, এটি বরং বাঁশি বাজিয়ে নজর কেড়ে নেওয়ার মতো এ গোলাপি রং! এলিজাবেথ আরডেন ছাড়ল দ্য নিউ ওরিয়েন্টাল লুক। পূর্বের মোহিনী শক্তির সাথে রহস্যময়তার মিলন নাকি ঘটেছে এতে। গোলাপি ক্যাডিল্যাকে করে বাড়িতে লিপস্টিক পৌঁছে দেওয়ার পথ বেছে নেয় মেরি কে এবং অ্যাভন।

এ প্রতিযোগিতার তীব্রতা ছিল ভয়ংকর। বিশাল লাভের অঙ্ক জড়িয়ে ছিল এর সাথে। পাশাপাশি ল্যাং মেরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও ছিল। শীর্ষস্থানীয় লিপস্টিক নির্মাতা হ্যাজেল বিশপ দেখতে পেলেন তার ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে। বাণিজ্যিক গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার মতলবে এ কাজ করা হয় বলে ধারণা। সন্দেহের তির যায় রেভলনের দিকে। রেভলনের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞাপনের অমোঘ ক্ষমতা লিপস্টিক যুদ্ধে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যদি কোনো কোম্পানি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে, এটি আপনাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, আত্মবিশ্বাসী এবং আবেদনময়ী করে তুলবে, তাহলে হয়তো ওই পণ্য ক্রেতার পকেট উজাড় করতে পারবে। এই লিপস্টিক লাগানোর পর ভিন্নতর আমেজ অনুভব করবে। কিন্তু শতভাগ একই রকম দেখতে ভিন্ন কোম্পানি বা ব্র্যান্ডের লিপস্টিক ওই একই অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে না। ফায়ার অ্যান্ড আইসের বিজ্ঞাপন সাফল্য মার্কিন নারীকে সাহসী, আবেদনময়ী এবং বিদ্রোহের ছটায় ভূষিত হতে উৎসাহ জোগায়।

ক্রেতা আকর্ষণের জন্য লিপস্টিকের নামকেও আকর্ষণীয় করে তোলা হতে লাগল। মেরি কোয়ান্ট ১৯৬০-এর দশকে প্রসাধনী প্যাকেজ করার প্রচলিত পদ্ধতির বিপ্লব ঘটান। মেয়েলিপনাকে বিদায় করে দিয়ে তিনি প্রসাধনী কেসগুলোয় কালো এবং রুপালি রং ব্যবহার করলেন। ১৯৭০-এর দশকে কোয়ান্টের পরামর্শক সৃজনশীল সু স্টুয়ার্ড জানালেন, তারা এমন লিপস্টিক তৈরি করতে যাচ্ছে, যা সহজে মুছে যাবে না। এর নাম দেওয়া হলো মেক আপ টু মেক লাভ।

নামকরণের এ পথ বেয়ে ১৯৯০-এর দশকের প্রসাধন পণ্য এবং লিপস্টিকের নাম রাখার প্রথা আরও জোরদার হলো। লোরাকের প্রতিষ্ঠাতা ক্যারল শ কেবল খ্যাতনামা ব্যক্তি, স্থান বা পছন্দনীয় বস্তুর নামে লিপস্টিকের নাম দিতে শুরু করেন। তার কথা হলো, প্রতিটি লিপস্টিকের একটি কাহিনি আছে। বেনিফিট তাদের ১৯৯৮ সালের বসন্তকালীন প্রসাধনী পণ্যের জন্য অদ্ভুত সব নাম বেছে নিল। যেমন 'লাইক, উহ' 'ডিপস্টিক' এবং 'প্যাডিডিল'। এসব নামের পেছনের দর্শন হলো, আমাদের ক্রেতারা যেন দোকান থেকে হাসতে হাসতে বের হয়ে যায়।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানী ডেবি দেন মনে করেন, লিপস্টিকের নামকরণ হলো আশাভরা নলের মতো। একই রঙের যদি কয়েক ব্র্যান্ডের লিপস্টিক থাকে, তবে ক্রেতা তা থেকে বেছে নেওয়ার সময় নামকরণ দিয়ে প্রভাবিত হবেন।

নারীবাদী যুগের আগমনের মধ্য দিয়ে কেবল ব্রা পোড়ানোই হয়নি; বরং লিপ গ্লসের উদ্ভব ঘটে। নারীদের যে দল মুখ বা ঠোঁট রাঙানো থেকে দূরে রইলেন, লিপ গ্লস হলো তাদের প্রতি প্রসাধনশিল্পের অভিনন্দন হয়ে এল—এমন কথা বলা হয়। আর যারা অধর রাঙানোর প্রথা মেনে চললেন, তাদের জন্যও এটি বাড়তি সুবিধা দিল। কোনো কোনো লিপ গ্লসে সুগন্ধীও জুড়ে দেওয়া হলো।

১৯৯০-এর দশকে আবার ফিরে আসে লিপ গ্লস। ক্লিনিক, কিহেলস, প্রেসক্রিপটিভস এবং অরিজিনের মতো কোম্পানি নারীর স্বাভাবিক রূপ-লাবণ্য তুলে ধরতে নিয়ে আসে লিপ গ্লস। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম আট মাস লিপ গ্লসের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ঘটে। লানকোমের ব্রিও নামের লিপ গ্লসের বিস্ময়কর সাফল্যের কারণে এমনটি ঘটে।

সৌন্দর্যপণ্যের ব্যবসা দিনে দিনে শুধু বেড়েছেই। কারণ প্রমাণিত হয়েছে, এ ব্যবসা থেকে মোটা মুনাফা করা যায়। এবং এটা বড় বড় শিল্প কোম্পানিগুলোর শ্যেনদৃষ্টি এড়ায়নি। ম্যাক্স ফ্যাক্টর এবং এলিজাবেথ আর্ডেনের মতো নামকরা প্রসাধনী ব্র্যান্ডগুলো পেল অপ্রত্যাশিত ক্রেতা। এলি লিলির মতো ওষুধ কোম্পানি এবং নর্টন সাইমন যথাক্রমে ওই দুই কোম্পানিকে কিনে নেয়। সৌন্দর্যচর্চায় গণসেবার বদলে ব্যক্তিগত সেবা দেওয়ার মতো পুরোই নতুন পথও তৈরি হলো এ সময়ে। ফেস ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন রেভলনের সাবেক কর্মী সুজান গ্রেসন। আইসক্রিম চেখে দেখার মতোই লিপস্টিক চেখে দেখবে বলে কল্পনা করেন তিনি। ২২৯টি শেডের লিপস্টিক তৈরি করেন তিনি। এদিকে সাশ্রয়ী দামে প্রসাধনী

লিপস্টিকের জগতে এককালে কেবল লাল ও গোলাপি রঙের প্রাধান্য ছিল। এ অবস্থায় অশ্বেতাঙ্গ নারীর লিপস্টিক পছন্দ করার অবকাশ খুবই কম ছিল। এম এ সির ফ্রাঙ্ক তোসকান এবং অন্যান্য প্রসাধনশিল্পী, বাদামি, গাঢ় লাল, নীল, হলুদ, তামাটে, কালো, রুপালিসহ নানা রঙের লিপস্টিক আনেন। হার্ড ক্যান্ডি এবং আরবান ডিকের মতো কোম্পানিগুলো সাহসী পদক্ষেপ নেয়। নানা রঙের লিপস্টিকে ভরপুর হয়ে ওঠে বাজার।

বিক্রির প্রতিশ্রুতি নিয়ে লিপস্টিকসহ নিজস্ব প্রসাধনপণ্য তৈরি করা শুরু করেন অষ্টাদশী অ্যাড্রিয়েন আর্পেল। তিনিও রঙের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি নিজস্ব সেলুনগুলোর মাধ্যমে এসব পণ্য বিক্রির চল তৈরি করেন।

প্রসাধন বিপণনের সর্ববৃহৎ বিপ্লবের ঢেউ আসতে বাকি তখনো। ১৯৮০ দশকে প্রসাধনশিল্পীরা গ্ল্যামারজগতের শুরু বনে যান। পর্দায় খ্যাতনামা নটনটিদের শৈলীময় চেহারা বা চালচলন ফুটিয়ে তুলতে তাদের ভাড়া করা হতো। একইভাবে মডেলরাও তাদের শরণাপন্ন হতেন নিজকে উদ্ভাসিত করে তুলতে। নিজস্ব সৃজনশীলতা এবং সৃষ্টির দৌলতে একনিষ্ঠ ভক্তদল পেয়ে যান প্রসাধনশিল্পীরা। প্রসাধনশিল্পীরা অনেককাল ধরেই নিজেদের লিপস্টিক নিজেরাই তৈরি করতেন। নিজেদের ক্রেতা এবং শিল্পজগতে তাদের তৈরি পণ্যের চাহিদা কেবল বাড়ছিলই। এরই পটভূমিতে এ পণ্য বিক্রি করার কাজটিও শুরু করেন তারা। ফ্রাংক টোসকান ছিলেন এ ধারার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি টরেন্টোসহ অনেক স্থানে প্রসাধনশিল্পীদের জন্য দোকান চালু করেন তিনি।

তিনি প্রথম প্রথম লিপস্টিক তৈরিতে রান্নাঘরের চুলা ব্যবহার করতেন। এ নিয়ে তার বয়ান হলো, বানানো সহজ কিন্তু পছন্দমতো লিপস্টিক খুঁজতে গেলে হতাশ হয় বলেই প্রথম পণ্য হিসেবে এটি বানানোর কাজ শুরু করি। আমি এমন লিপস্টিক চাচ্ছিলাম, যা কিনা খুঁজে পাওয়া যায় না। কড়া আলোর ধকল সইতে পারে। দীর্ঘক্ষণ ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে। প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর আবার লাগাতে হয় না।

এ মিছিলে এবারে যোগ দিলেন ববি ব্রাউন, ট্রিশ ম্যাকইভয়, লরা মার্সিয়ার, জিনাইন লোবেল, ক্যারল শ এবং ফ্রাঙ্কোইন নার্স। প্রসাধনশিল্পী হিসেবে নিজ দক্ষতার প্রমাণ দিয়েই তবে প্রসাধনীর জগতে পা রাখেন তারা।

সাময়িকীর জন্য ছবি তোলার প্রয়োজনে মনমতো লিপস্টিক খুঁজে পাননি ববি ব্রাউন। তিনি লিপস্টিকের মাত্র ১০টি শেড তৈরি করেন প্রথমে। সেগুলো একটি দোকানে বিক্রি করতে দেন। ভেবেছিলেন, মাসে এক শ টিউব হয়তো বিক্রি করতে পারবে। এক দিনেই তার চেয়ে বেশি লিপস্টিক বিক্রি হয়ে যায়।

লিপস্টিকের তৈরিতে নামেন ক্যারল শও। ফারাহ ফসেট বিশেষ একটি গোলাপি লিপস্টিক ব্যবহার করতেন। হঠাৎ করেই সে লিপস্টিক তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। ক্যারল শ লিপস্টিক বানানোর সময় সেই গোলাপি লিপস্টিকের কথা মনে রাখেন। তার তৈরি এ লিপস্টিক ফারাহ ফসেটেরও পছন্দ হয়।

লিপস্টিকের জগতে এককালে কেবল লাল ও গোলাপি রঙের প্রাধান্য ছিল। এ অবস্থায় অশ্বেতাঙ্গ নারীর লিপস্টিক পছন্দ করার অবকাশ খুবই কম ছিল। এম এ সির ফ্রাঙ্ক তোসকান এবং অন্যান্য প্রসাধনশিল্পী, বাদামি, গাঢ় লাল, নীল, হলুদ, তামাটে, কালো, রুপালিসহ নানা রঙের লিপস্টিক আনেন। হার্ড ক্যান্ডি এবং আরবান ডিকের মতো কোম্পানিগুলো সাহসী পদক্ষেপ নেয়। নানা রঙের লিপস্টিকে ভরপুর হয়ে ওঠে বাজার।

এখন প্রায় সব রঙেরই লিপস্টিকের দেখা মেলে। এই বাংলা মুলুকেও অস্বাভাবিক হিসেবে গণ্য এমন রঙের লিপস্টিকও পাওয়া যায়।

এইডস থেকে ক্যানসার সব ধরনের রোগ নিরাময়ের গবেষণায় ব্যাপক অঙ্কে অর্থের জোগান দিয়েছে লিপস্টিক-শিল্প। বিপণনজগতে উল্লেখযোগ্য লভ্যাংশ পাওয়ার সাথে তাল রেখেই চলেছে এ তৎপরতা। পরিবেশ এবং সামাজিক সচেতনতাকে রোজ রোজ জোরদার করে তুলছে ওষ্ঠ রাঙানোর এ প্রসাধনী। ১৯৯৪ অক্টোবরে নিজেদের সর্বোচ্চ বিক্রিত লিপস্টিক বেরি কিস লং লাস্টের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্রেস্ট ক্যানসার রিসার্চ ফাউন্ডেশনে দান করেছে এটি নির্মাণকারী কোম্পানি ক্লিনিক। ১৯৯৬-এ 'লিপ-স্টেইন অকশন' বা 'ঠোঁটের ছাপের নিলামের' আয়োজন করে আমেরিকান ফাউন্ডেশন ফর এইডস রিসার্চ বা এএমএফএআর। এতে অংশ নেন ২৭ খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। এ নিলামে সবচেয়ে চড়া দর ওঠে লিডা ইভানজেলিস্টার কাগজের ওপর দেওয়া ঠোঁটের চুম্বনের ছাপ। এটি বিক্রি হয় এক হাজার মার্কিন ডলারে। ভিভা গ্লাম লিপস্টিক বিক্রি করে এমএসি এইডস তহবিলের জন্য এক কোটি ডলার তোলা হয়। এ অর্থ এইডসের নানা সংস্থার মধ্যে বিলানো হয়। খুচরা বিক্রেতার এ লিপস্টিক বেচে কোনো লাভ করে না। এটি বানানোর কাজে জড়িত কর্মীরা শ্রম দেওয়ার জন্য কোনো কমিশন নেয় না। এমএসি এই লিপস্টিক বানানো থেকে দোকানে পাঠানো পর্যন্ত গোটা খরচ বহন করে। এটি কিনতে ক্রেতারা যে অর্থ ব্যয় করে, তা পুরোটাই দান হিসেবে ফিরে যায়—এ কথা বলেন তোসকান। এই একই প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব তৎপরতা গ্রহণ করেছে। প্রাণীকুলের ওপর প্রসাধনী পরীক্ষা বন্ধ করেছে। বডি শপ, অরিজিন, অ্যাভেডাসহ আরও অনেক কোম্পানি এমন মানবিক মিছিলে যোগ দিয়েছে।

লিপস্টিক এখন অনেক মানবিক তৎপরতার সঙ্গী এবং সহযোগী হয়ে উঠেছে।

লিপস্টিক বাজার লিপস্টিক সূচক

এম এ মোমেন

লিপস্টিকতত্ত্ব: অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় থাকলে লিপস্টিক বিক্রি বেড়ে যায়, লিপস্টিকের বাজারের তুলনামূলক আকার বড় হতে থাকে।

নোবেল বিজয়ী টনি মরিসন লিখেছেন, স্বপ্ন হচ্ছে লিপস্টিক মাখানো দুঃস্বপ্ন।

জর্জ ওয়াশিংটন ঠোঁটে লিপস্টিক দিতেন আর রানি ভিক্টোরিয়া মনে করতেন ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়া ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ।

বাংলাদেশে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্প্রতি বলেছেন, তার এলাকার নারীরা দিনে তিনবার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগান। তিনি সরকারেরও অন্যতম মুখপাত্র। তার এলাকার নারীরা যে সুখে আছেন (অন্যান্য এলাকায় নারীরা দিনে কবার ব্যবহার করে থাকেন, এ নিয়ে কোনো সমীক্ষার ফলাফল জানা নেই), এটা তারই সূচক। দিনে একবার, দুবার নয়, তিনবার; এটা তার কাছে সুখের প্রতিচ্ছবি!

সুখ নিশ্চয়ই সমৃদ্ধির সাথেও কিছুটা জড়িয়ে আছে। অভুক্ত মানুষের সুখে থাকার প্রশ্নই আসে না–তার বেলায় লিপস্টিক তো অবান্তর প্রসঙ্গ। বরং সুখী মানুষের লিপস্টিক ব্যবহার নিয়েই তাত্ত্বিক আলোচনা চলতে পারে।

সানন্দে এখন তিনবার ব্যবহার করেন মানে আগের চেয়ে বেশি ব্যবহার করেন, আগে হয়তো দুবার কিংবা একবার করতেন, কিংবা আদৌ ব্যবহার করার সামর্থ ছিল না কিংবা ব্যবহার করার কথা তারা ভাবেননি। যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অন্তর্গত কথা হচ্ছে সে এলাকার নারীরা আগের চেয়ে বেশি লিপস্টিক কিনছেন।

এই বেশি কেনাকাটাকে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক ও তত্ত্ব ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে দেখতে গেলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটানো সম্ভব হবে। লিপস্টিক মার্কেটের গতিময়তার একটি তত্ত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

আরোপিত কোনো কারণেও লিপস্টিক বাজারের পতন বা উত্থান ঘটতে পারে। ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো নিষিদ্ধ করে দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ানরা তখন মনে করতেন লিপস্টিক ব্যবহারকারী নারী ছলনাময়ী, তারা পুরুষকে ফাঁদে ফেলার জন্য ঠোঁট রাঙাচ্ছেন। এর সাথে প্রেতচর্চার একটা যোগাযোগ থাকতে পারে। সেকালে পার্লমেন্টে কি কোনো নারী ছিলেন না? জি না, নারীর ভোটাধিকারই ছিল না। তাদের ভোট পেয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হবার কোনো সুযোগই ছিল না।

বৈশ্বিক কসমেটিক বাজারের আকার সমরাস্ত্র বাজারের মতো অতিকায় না হলেও উপেক্ষা করার মতো নয়। ২০২২ সালে এ বাজারের আকার ছিল ৩৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, এ বাজার বিউটি ইন্ডাস্ট্রির। চক্রবৃদ্ধিতে ২০৩২ সালে এর আকার দাঁড়াবে ৬৬১.১২ বিলিয়ন ডলারে; চক্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ৫.৮ ভাগ। এরই একটি ছোট অংশ লিপস্টিক। ২০২১ সালে লিপস্টিকের বিশ্ববাজার ছিল ৯.৫৭ বিলিয়ন ডলারের, ২০২২-এ তা বেড়ে হয়েছে ১০.০৮ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৩-এর শেষে তা দাঁড়াবে ১৪.৬৮ বিলিয়ন ডলারে। বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে লিপস্টিকের প্রবৃদ্ধি অন্যান্য আইটেমের চেয়ে একটু কম, ৫.৫ শতাংশ। লিপস্টিক মার্কেটের টার্গেট মূলত ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারী। আমাদের প্রতিবেশী ভারতে বিউটি ইন্ডাস্ট্রির আকার ২০২৩ সালে ৩০.৫৪ বিলিয়ন ডলার, এর মধ্যে লিপস্টিকের শেয়ার ১.৩৮ বিলিয়ন ডলার।

একটি গাণিতিক হিসাব উপস্থাপন করা যেতে পারে: বিউটি ইন্ডাস্ট্রির কত ভাগ লিপস্টিক ইন্ডাস্ট্রি? ওপরের পরিসংখ্যান থেকে উঠে আসে বিশ্বের মোট বিউটি ইন্ডাস্ট্রির ০.২৬ ভাগ হচ্ছে লিপস্টিকের বাজার আর ভারতে তা .০৪৫ ভাগ। বিশ্বগড়ের দ্বিগুণের চেয়ে কিছু কম। অর্থাৎ ভারতে অর্থমূল্যে লিপস্টিক বিক্রি অনেক বেশি। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের একই হিসাব নিয়ে দেখেছি, যুক্তরাষ্ট্রে লিপস্টিকের শেয়ার ভারতের চেয়ে কম এবং ব্রিটেনে তা প্রায় ভারতের এক-তৃতীয়াংশ। এই পরিসংখ্যান প্রচলিত লিপস্টিক ইনডেক্স তত্ত্বের সমর্থন করে। অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় থাকলে লিপস্টিক বিক্রি বেড়ে যায়, লিপস্টিকের বাজারের তুলনামূলক আকার বড় হতে থাকে।

অর্থনীতির লিপস্টিক এফেক্ট: যখন অর্থনীতিতে ধস নামতে থাকে, ভোক্তার হাতে ব্যয় করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না। তখন দামি প্রসাধনসামগ্রী না কিনে কেবল লিপস্টিক কিনে বাড়ি ফেরে। এভাবে ভোক্তার লিপস্টিক কেনা বেড়ে যায়। লিপস্টিক এফেক্ট বুঝিয়ে দেয় ভোক্তার হাতে তেমন টাকা নেই, আরও বলে দেয় দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। লিপস্টিক এফেক্টের কারণে সংবাদপত্রে ইংরেজি জ অক্ষরের শব্দ ব্যবহার বেড়ে যায়। সেই শব্দটি হচ্ছে জবপবংংরড়হ.

লিপস্টিক ইনডেক্স বা লিপস্টিক সূচক কথাটি নতুন সহস্রাব্দের সংযোজন। বিখ্যাত প্রসাধনসামগ্রী কোম্পানি এস্টি লাউডারের চেয়ারম্যান লেনার্ড লাউডার ২০০১ সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং অর্থনীতিবিদেরা তা লুফে নেন। তিনি লক্ষ করেন, ২০০১ সালের শরতে যখন একধরনের আর্থিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল, সে সময় কম দামি বিউটি প্রোডাক্ট বিশেষ করে লিপস্টিক বিক্রি বেড়ে যায়। ক্রেতার আচরণ বাজারকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, বাজারে বিকল্প পণ্যও ক্রেতার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনুমানটি হচ্ছে অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা শুরু হলে নারী ভোক্তা অধিকতর দামি পরিধেয় যেমন জুতো কিংবা পোশাক কিনতে না পেরে লিপস্টিক কেনেন।

লিপস্টিক মার্কেটের গতিময়তা আমাদের সঠিকভাবে বুঝতে হবে, নতুবা লিপস্টিক বিক্রি বাড়াকে যদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষণ মনে করি, ভুল হবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে লিপস্টিক অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানান দেবে, এটাও মনে না করা ঠিক হবে না।

তবে সাধারণভাবে যখন লিপস্টিক-বন্দনা শুরু হবে, ধরে নিতে হবে লিপস্টিক সূচক এসে গেছে অথবা এসে গেছে বলে বন্দনাকারীর কাছে অনুভূত হয়েছে, সামনে দুঃসময়।

তাই বলে আমরা লিপস্টিক ডে পালন করব না–এমন কথা নেই। যুক্তরাষ্ট্র ২৯ জুলাই জাতীয় লিপস্টিক দিবস পালন করে যাবে। আমরাও তার সাথে যোগ দিতে পারি অথবা নিজেদের সুবিধামতো একটা দিন ঠিক করে নিতে পারি। যেদিন তিন লিপস্টিকের বিষয়টি সামনে এসেছে, সেটাও হতে পারে। ন্যাশনাল লিপস্টিক ডেতে নিজের জন্য, প্রিয়জনের জন্য একটা লিপস্টিক কিনুন। পিঙ্ক পিজিয়ন ব্র্যান্ড যেমন আছে, তেমনি আছে ইউনিকর্ন টিয়ার্স। আরও শত শত দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ড। বাংলাদেশে এস্টি লাউডারের জেনুইন ব্র্যান্ড যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মেলে জিঞ্জিরা ব্র্যান্ড। হালাল সাবানের কথা আমরা শুনেছি, কেমন করে হালাল শব্দ যোগ হওয়াতে মুসলমান ক্রেতার সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়ে বাজার মাত করে দিয়েছিল। বাজারে হালাল লিপস্টিকও এসেছে। লাফজ্ হচ্ছে প্রসাধনীর হালাল ব্র্যান্ড। এতে শূকর তো নয়ই, অন্য কোনো প্রাণীর চর্বিও ব্যবহার করা হয় না বলে দাবি করা হয়ে থাকে।

কানাডিয়ান একটি সমীক্ষায় (১৯৯৮ সালে) দেখা গেছে, একজন নারী তার জীবদ্দশায় ৪ থেকে ৯ পাউন্ড ওজনের লিপস্টিকের প্রলেপ ঠোঁটের ওপর লাগিয়ে থাকেন।

লন্ডন এক্সপ্রেস ২০০১ সালে দাবি করেছে, ব্রিটেনে একজন নারী জীবদ্দশায় গড়ে ৫.৬৫ পাউন্ড লিপস্টিক চেটে থাকেন এবং গেলেন। ডেনভারের রকি মাউন্টেন নিউজ মনে করে, একজন নারীর ত্বাতে-অজ্ঞাতে গিলে ফেলা লিপস্টিকের ওজন প্রায় ৪ পাউন্ড।

লিপস্টিক দেখেই উদ্বেলিত হওয়া সমীচীন হবে না। যারা কেজিবির কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত, তারা জানেন, কেজিবি ৪.৫ মিলিমিটার সিঙ্গেল শট লিপস্টিক পিস্তল ব্যবহার করত।

উইলিয়াম জর্জ হিরেনস (১৯২৮-২০১২) নামের সিরিয়াল কিলার লিপস্টিক কিলার নামে পরিচিত। তিনি তিনটি খুনের কথা স্বীকার করেছেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৫ ফ্রান্সিস ব্রাউনকে তার অ্যাপার্টমেন্টে খুন করার পর তার লিপস্টিক দিয়ে দেয়ালে লিখে রেখেছেন: ঈশ্বরের দোহাই আর একটি খুন করার আগে আমাকে ধরে ফেলুন, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না।

পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। তারপর সুজান ভেগনানকে খুন করে। তারপর ধরা পড়েন। তার আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়। ৬৫ বছর জেলখাটার পর ৬ মার্চ ২০১২ ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে মারা যান। লিপস্টিক কিলারকে নিয়ে চার্লস আইস্টাইনের একটি উপন্যাস রয়েছে, তা চলচ্চিত্রায়িতও হয়।

করোনাকালের লিপস্টিক ইনডেক্স

বিউটি ইন্ডাস্ট্রির প্রধান ভোক্তা নারী। সৌন্দর্যে আরও মূল্য সংযোজন করার পর তা ঢেকে রাখার কোনো মানে হয় না। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় নিরাপত্তার মুখোশ পরতেই

ফ্যাশন আইকন ডিয়ানা ফ্রিল্যান্ড ঠোঁটে তাঁর সিগনেচার লাল লিপস্টিক।

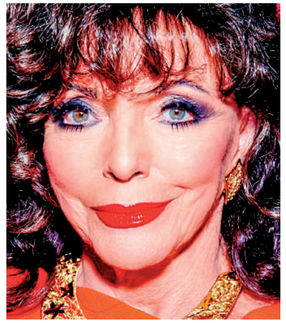

জোয়ান কলিন্সের প্রিয় লাল লিপস্টিকই।

হয়েছে। তাতে লিপস্টিক মাখানো ঠোঁট প্রদর্শনের সুযোগ নেই। সুতরাং লিপস্টিক উৎপাদক ও লিপস্টিক বিক্রেতার মাথায় হাত। কিন্তু ফুলেফেঁপে উঠেছে মাস্ক ব্যবসায়ী। পরনের কাপড়ের সাথে ম্যাচিং করা মুখোশও মিলেছে। এখনো মিলছে।

বিউটি ইন্ডাস্ট্রির আওতায় আসে ত্বকের যত্ন, কসমেটিকস চুলের যত্ন। পারফিউম এবং ব্যক্তিগত সেবা। করোনাভাইরাস সংক্রমণের আতঙ্ক এই শিল্পে ধস নামিয়েছে। মন্দাবস্থায় জাপান ও ফিলিপাইনে নেইলপালিশের বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় সেখানে নেইলপালিশ ইনডেক্সের কথাও শোনা গেছে।

তবে করোনাকালে মাস্ক পরিহিত নারীর দিকে চোখ পড়লে স্পষ্টতই মনে হতে পারে মাসকারার বিক্রি সম্ভবত বেড়ে গেছে–এবার বাস্তবিকই বিউটি ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খাপার কিছু সময় অন্তত মাসকারা ইনডেক্স লেনার্ড লাউডারের তত্ত্বকে সমর্থন করবে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের আগে বিউটি ইন্ডাস্ট্রিজের উৎপাদনের ৮৫ ভাগই সরাসরি দোকান থেকে বিক্রি হতো। এমনকি ভার্চুয়াল জগতে অভ্যস্ত তরুণীরাও দেখেশুনে তাদের ক্রয়ের ৬০ ভাগই নিতেন দোকান থেকে। এই বিশ্বব্যাধি অন্তত ৩০ ভাগ দোকানে তালা ঝুলিয়েছে, যার অনেকগুলো এর মধ্যে দেউলিয়াও হয়ে গেছে। এদিকে আমাজান ও সেপোরা অনলাইনে প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি বেড়েছে কমপক্ষে ৩০ ভাগ।

মাস্কের বাধ্যবাধকতা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ মান্য করতে হচ্ছে বলে মেকআপ আইটেম এবং দামি ব্র্যান্ডের পারফিউম বিক্রি ৫৫ থেকে ৭৫ ভাগ নেমে গেছে। চীনের আলিবাবার উপাত্ত থেকে দেখা যায়, চোখের কসমেটিকস বিক্রি বেড়েছে ১৫০ ভাগ। ফ্রান্স যখন লকডাউন ঘোষণা করতে যাচ্ছিল, তখন হাত ধোয়ার ব্র্যান্ড সোপ বিক্রি ৮০০ ভাগ বেড়ে যায়। করোনাকালে আমাজনের চোখের প্রসাধন বিক্রি বেড়েছে ২১৮ ভাগ, কলপ বিক্রি ১৭২ ভাগ। বহু বিউটিপার্লার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ড্রু-ইট-ইউরসেলফ প্রসাধন বিক্রি বেড়ে গেছে বহুগুণ।

মাস্ক লিপস্টিকের জন্য হুমকি হলেও জুম মিটিংয়ে অংশগ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় পছন্দের লিপস্টিক কেনাতে এর প্রভাব পড়েছে, বিক্রি বেড়েছে। বিউটি ইন্ডাস্ট্রি মিলেনিয়ালদের দখলে চলে আসছে, তারা বাজারের স্বচ্ছতা দেখতে চাইছে এবং পরিবেশবান্ধব প্রসাধন চাইছে, প্রতিযোগিতামূলক বাজার চাইছে।

লিপস্টিক-বন্দনা

জোয়ান কলিন্সের কথা: পৃথিবীতে যত প্রসাধনী দ্রব্য আছে, আমার কাছে লিপস্টিকই সর্বোত্তম। ●

পারফেক্ট ক্রাইম

সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

অলংকরণ: মাহাতাব রশীদ

ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। আজকাল মোবাইলেই কাজ চলে যায়, তা-ও পুরোনো অভ্যাসেই অভ্যস্ত আমি। ল্যাপটপে নয়, খাতা-কলমে লিখি, চিঠি পাঠিয়ে প্রিয় মানুষগুলোর খোঁজ নিই কখনো কখনো, প্রতিদিন নিয়ম মেনে বিটিভির রাত আটটার খবর পড়ি। আমার প্রায় ষাটোর্ধ্ব বাবা, তিনিও আমার বাসায় এলে থাকতে চান না। বলেন, তোর বাসায় কিছু করার মতো নেই। তোর মতোই। বোরিং!

আমার জীবনযাপন যে বোরিং, তার কোনো আন্দাজ অবশ্য 'পারফেক্ট ক্রাইম' কলামের পাঠকদের দেই। ওটা আমি লিখি, প্রতি মঙ্গলবার দৈনিক ইতিহাসের বিশেষ পাতায় যায় সেটা। শুধু ওই কলামটা পড়ার জন্যেই মঙ্গলবার পত্রিকার কাটতি বাড়ে, বেশ কিছু বাড়তি পত্রিকা ছাপাতে হয় সম্পাদককে। সব মিলিয়ে আমি ভালো আছি, মানে ছিলাম আরকি। টেলিফোনটা আসার ঠিক আগ পর্যন্ত।

'আহমেদ রিজভী বলছি। কে বলছেন?'

'রিজভী সাহেব, আপনার পারফেক্ট ক্রাইমের গত সংখ্যার কলামটা দারুণ হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।' মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল নিজের অজান্তেই। 'কিন্তু আপনি কে বলছেন জানতে পারি?'

'আজ থেকে উনিশ বছর আগে, বয়স মাত্র ৫ আমার তখন। আমার বাবা প্রায়ই মদ্যপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন। আমার কুকুর রিংকু ঘেউ ঘেউ করলে ওকে লাঠি দিয়ে মারার চেষ্টা করতেন। তবে লাভ হতো না। মাতাল মানুষ একটার জায়গায় তিনটা কুকুরের মাথা দেখত। তাই ভুল মাথায় লাঠি মারত বাবা। সেই বাড়ি গিয়ে লাগত রিংকুকে জড়িয়ে ধরে আতঙ্কে কাঁদতে থাকা আমার মাথায়। সবাই বলে আমার মাথাটা নাকি ওই বাড়ি খেয়ে খেয়েই ঢিলে হয়ে গেছে।'

'সরি, এসব আমাকে বলছেন কেন। কে বলছেন আপনি?' এবার হাসি সরে গিয়ে গলাটা প্রায় চিৎকারের দিকে এগোল আমার।

'আমার নাম যেকোনো একটা বানিয়ে ফেলুন আপনি। মাথায় তো অনেক আইডিয়া ঘোরে আপনার। তবে মাথা ঢিলে হওয়ার ব্যাপারটা বললাম, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড না জানলে লিখবেন কী করে? যাচাই করবেন কী করে যে আমার করা ক্রাইমগুলো পারফেক্ট হয়েছে কি না?' লোকটা হাসতে হাসতে বলল।

'ক্রাইম মানে? আপনি কি মজা নিচ্ছেন? আমি ফোন রাখছি। এসব আজেবাজে কথা বলার সময় নাই আমার।'

'ঠিক আছে। আজেবাজে কথা বাদ। সত্যি করে বলুন তো, এই যে সোহেলী হত্যা রহস্য নিয়ে সব পত্রপত্রিকা এত লিখছে, এত ছুটছে পুলিশ। অথচ আপনার পারফেক্ট ক্রাইমে ঘটনাটা উঠল না কেন?'

'কম্পিটিশন ছিল। ইটভাটার খুনটায় আগে থেকে অনেক প্ল্যান করে, সবকিছু দেখেশুনে ক্রাইমটা করা হয়েছে। সোহেলী হত্যাকাণ্ডে খুনি একটা সাইকো। নাহলে একটা মানুষকে এভাবে একটু একটু করে শরীরের অংশ আলাদা করে মৃত্যু দেওয়া যায় না। খুন না, এ তো উন্মাদনা।'

'যাহ বাবা, ধরেই নিলেন মরে গেছে? পাঠিয়েছি তো শুধু আঙুল, কান আর এই টুকিটাকি। তাতেই আশা ছেড়ে দিলেন। ভাগ্যিস রিজভী সাহেব আপনি পুলিশ ফোর্সে নেই। না হলে তো কেস প্রমাণ ছাড়াই সলভ করে ফেলতেন।'

'পাঠিয়েছি মানে? কী বলছেন? সোহেলী কি বেঁচে আছে?'

'না না না না। ওকে পুড়িয়ে গাছের সার করে দিয়েছি আমি এর মধ্যেই। জানেন তো রিজভী সাহেব, মানুষের শরীরটা কিন্তু গাছের জন্য দারুণ পুষ্টিকর। মানুষের জন্যেও হয়তো। কিন্তু আর যা-ই হোক, এতটাও খারাপ না আমি যে স্বজাতি ভক্ষণ চলবে। অসব চায়না-ফায়নায় হতে পারে। আমাদের তো একটা গর্ব আছে তাই না? বাঙালি তো। কি বলেন?'

'ভুলভাল বকছেন কেন? কেন এ রকম করছেন? কেন মেয়েটাকে মারলেন?'

'বাহ, বিশ্বাস হয়ে গেছে যে আমিই মেরেছি। তা-ও সম্মানটা যায়নি দেখছি। এখনো আপনি সম্বোধনেই আছেন। ভালো। কাজের কথায় আসি এবার শুনুন। আমার আসলে খুব ইচ্ছা আমাকে, মানে আমার কাজকে নিয়ে আপনার ওখানে দু-কলাম লেখেন। ওই শখ বলতে পারেন আরকি। আপনার ওখানকার পারফেক্ট ক্রাইম পড়েই তো এ বিষয়ে আগ্রহ হলো। আর শিল্পের স্বীকৃতি পেলে কোন শিল্পীরই না ভালো লাগে বলুন?'

'এটা শিল্প?' মুখ দিয়ে কথা প্রায় বেরোচ্ছে না আমার। তা-ও তোতলাতে তোতলাতে বললাম।

'শিল্প নয়? ঠিক আছে, তাহলে না হয় নিজের শিল্পসত্তাকে আরেকটু শাণিয়ে নিতে আরেকটু প্র্যাক্টিস করি। তবে রিজভী সাহেব, আর যা-ই বলুন না কেন, আপনি যদি আপনার পত্রিকায় আমাকে নিয়ে কলাম না লেখেন না, তা হলে কিন্তু আমি এই প্র্যাক্টিস চালিয়েই যাব। একটা পারফেক্ট ক্রাইম করে তবেই আমার মুক্তি।'

'মুক্তি? মুক্তি মানে? ছেড়ে দেবেন এই পথ? খুন করে ভালো হওয়ার ঢং করলেই ভালো হয়ে যাওয়া যায়?'

'না না না। আমি কেন ভালো হতে যাব। একবার একটা জুতসই খুন করলেই আমার কাজ সমাপ্ত হবে। পারফেক্ট একটা কাজ পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারলে তখন আর আমার কাজ কী? এমনিতেও মেধাবী শিল্পীদের বেশি দিন বেঁচে থাকা উচিত না, কদর কমে যায়। এই যে যেমন সালমান শাহকেই ধরুণ, এখন বেঁচে থাকলে এমন কদর থাকত তার?'

'নিজেকে সালমান শাহের সাথে তুলনা করছেন?'

'করছি না। তবে আপনার ওখানে একটা কলাম ছেপে দিলেই করব, আর তখন টুপ করে ওপারে পাড়ি জমাব। ভালো না বুদ্ধিটা?'

'আমি বেঁচে থাকতে তোকে নিয়ে একটা কিছুই লিখব না।'

'এই তো তুই সম্বোধনে এসেছেন। এতক্ষণ কেমন যেন ফর্মাল ফর্মাল ব্যাপার লাগছিল। শোন, না ছাপলে না ছাপ, না লিখলে না লেখ। কিন্তু এরপর আর যা যা খুন হবে, আমি না, সেগুলোর জন্য দায়ভার বর্তাবে তোর ওপরেই। জেনে রাখিস।'

ফোন কেটে গেল। সাথে সাথেই কলিংবেলের শব্দ। শুনে একটু চমকে উঠলাম। দরজার ওপাশে ইন্সপেক্টর রশিদ আনোয়ার দাঁড়িয়ে।

'কেন এসেছি বুঝতেই তো পারছেন।' বললেন ইন্সপেক্টর।

'মানে?'

'মানে হলো ওই ফোন। ফোনটা আমার কাছে এসেছিল। জানি আপনার কাছেও এসেছে।'

'কিন্তু আমি ওর কাছে হারব না ইন্সপেক্টর। আপনারা আপনাদের কাজ করতে থাকুন। আমি ওর একটা ক্রাইম নিয়েও লিখব না আমার কলামে।'

হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকলেন ইন্সপেক্টর আমার দিকে। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম।

শহরজুড়ে প্রায়ই মোটিভ ছাড়া উদ্ভট খুনের ঘটনা ঘটছে। তবে সেগুলো ঘটার আগে টের পেয়ে যাচ্ছি আমি। ইদানীং তো খুনি উন্মাদটা আমার সাথে শলাপরামর্শও করা শুরু করেছে। ইন্সপেক্টর চেষ্টা করে যাচ্ছেন খুনিকে খুঁজতে, আমার গতিবিধি আর ফোনালাপটাও ট্যাক করছে পুলিশ। লাভ হচ্ছে না। একেকবার দ্বন্দ্বে পড়ে যাচ্ছি। কোনো মোটিভ ছাড়া ক্রাইম কী করে পারফেক্ট ক্রাইম হয়। কিন্তু খুনির মোটিভ যদি হয় আমার কলামে নিজের নাম আর প্রশংসা দেখা, সে ক্ষেত্রে তো তার ক্রাইম আসলেও পারফেক্ট। না হলে এত দিনে কি ধরা পড়ত না সে?

ইন্সপেক্টর প্রতিদিন আমার কাছে আসেন, কখনো থানায় তলব করেন। কেন মানুষকে মরতে দিচ্ছি আমি? কেন পরাজয় মানছি না?

জেদ? হয়তো। কিংবা হয়তো একটা উন্মাদের সামনে আইন, সত্য আর সাহসকে মাথা নুইয়ে দিতে দেখতে চাচ্ছি না। হার কি মেনে নেব? সেটাই কি ঠিক হবে?

'পুরো ব্যাপারটাই কি ইগোর ওপরে চালাচ্ছেন রিজভী সাহেব? এতগুলো মানুষ, না জানি সামনে আর কার প্রাণের ঝুঁকি আছে, এর দায় কি আপনার না? আপনার একটা হার মেনে নেওয়ায় এতগুলো মানুষের জীবন বাঁচে।' সম্পাদকের কণ্ঠে হতাশা, আকুলতা। সামনে ইন্সপেক্টর বসে আছেন।

'ইগো বা হারের কিছু না, স্যার। ব্যক্তিগত হার হলে আমার কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না এটা। কিন্তু এটা তো একটা খুনির কাছে, একটা সাইকোর কাছে গোটা সিস্টেমের হেরে যাওয়া। যে কেউ এরপর এভাবে মানুষ বা অন্য কিছু জিম্মি রেখে নিজের যা ইচ্ছা দাবি করে নেবে। কয়জনকে হ্যাঁ বলবে পুলিশ আর প্রশাসন?'

'আচ্ছা, আপনি আসুন।' সম্পাদকের কথায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

পরদিন পত্রিকায় চোখ বোলানোর আগেই টেলিফোনের ঘণ্টি বাজল।

'আপনি আপনার কথা রেখেছেন, আমাকে নিয়ে লিখেছেন আপনার পারফেক্ট ক্রাইম কলামে। ব্যস, এবার আমি বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন রিজভী সাহেব। আমার লাশটা কাউলার ডান পাশে যে রাস্তাটা, ওটার সামনের প্রথম ডোবাটাতেই পাওয়া যাবে। ভালো থাকবেন।' ঘুম থেকে উঠে কী ঘটছে কিছু না বুঝতেই এতগুলো কথা। টেলিফোন রাখার শব্দে সম্বিত ফিরল। দৌড়ে আজকের পত্রিকাটা তুলে নিলাম। সেখানে আমার হয়ে কেউ একজন উন্মাদ খুনির সর্বশেষ ভিক্টিমকে নিয়ে লিখেছে। খুনিকে কোনোভাবেই যে ধরা যাচ্ছে না, কোনো ক্লু রাখেনি সে, সেটা খুব ভালো করেই লেখা।

সোফায় বসে পড়লাম। আমার সিদ্ধান্ত বদলানো না গেলেও খোদ আমাকেই বদলে ফেলা সম্ভব। আর ঠেকাতে পারলাম না আমি।

সবার মধ্যে খুশির ছাপ। ইন্সপেক্টর, সম্পাদক, দেশবাসী সবাই খুশি। খুনি মারা গিয়েছে। কৃতিত্বটা ইন্সপেক্টর রশিদই পেলেন। কলাম লেখা থেকে সরে এসেছি আমি। পুরো ব্যাপারটাকেই অসম্ভব অসহ্য লাগছে আমার। এই পত্রিকা, এই লেখালেখি, এই মানবজীবন, এই বেঁচে থাকা–সব।

এমনই এক বিকেলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, কোনো কারণ ছাড়াই। টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো, কে বলছেন?'

'নিজের পরিচয়টা এখন আর দেন না নাকি?' সেই চেনা কণ্ঠস্বর।

'তুমি...তুমি...কীভাবে? তোমার লাশ...'

'দেখুন রিজভী সাহেব, সেদিন পত্রিকার লেখাটাও আপনি লেখেননি, তাই মৃত্যুটাও আমার হয়নি। আপনার লেখা আমি চিনব না? নাম আপনার থাকলেই হলো নাকি!'

'তাহলে ওই লাশটা...'

'মনে করুন, আমার তালিকার আরেকটা খুন। আমি দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি। কী অদ্ভুত না? এত দিন হলো কথা বলছি, তা-ও আমি পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে বুঝতেও পারবেন না আপনি। তবে তাই বলে ভাববেন না যে বেঁচে আছি, তাই আমি আবার খুন করার কাজে লেগে পড়ব। শিল্পী হিসেবে আমার সেরা কাজটা আমি করে ফেলেছি। পারফেক্ট ক্রাইমটা করে ফেলেছি আমি।'

'খুন, আবার?'

'খুনই তো বলুন? একজন লেখককে একটু একটু করে নিজের হাতে মেরে ফেললাম না? আপনি কি বেঁচে আছেন আদৌ?' অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল উন্মাদ খুনি। মেনে নিতে বাধ্য হলাম। হ্যাঁ, ও পেরেছে। মোটিভ, প্ল্যান, এভিডেন্স–সব মিলিয়ে পারফেক্ট ক্রাইমটা করেছে সে।

'তোমার নামটা জানতে পারি?' উত্তরে খট করে টেলিফোনটা কেটে গেল। জানি আর কখনো কোনো ফোন আসবে না এই ফোন। নিজের খুনির নামটা জানা হলো না আমার। ●

লিপস্টিকের বাহার কত!

১৬ পৃষ্ঠার পর

ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক করপোরেশন তাদের কারখানায় নারীদের চাকরিতে না নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেওয়ার পর। চারদিকে সমালোচনা শুরু হয়। এই সময় একটি পোস্টার ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, যেখানে দেখা যায়, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এক নারী তার পেশি বাগিয়ে পোজ দিয়েছেন। পোস্টারে ওপরের দিকে লেখা–'উই ক্যান ডু ইট'। নাওমি পার্কা ফ্রেলি নামে এক যুদ্ধকর্মী এই পোস্টারের মডেল হয়েছিলেন।

২০১৮ সালে ফ্রেলির মৃত্যুর পর নিউইয়র্ক টাইমসে তাকে নিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রোজি দ্য রিভেটার ও ফ্রেলির পোস্টার মানুষ ভুলতেই বসেছিল। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে সেই পোস্টার আবার উন্মোচিত করা হয় ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল আর্কাইভসে– নারীর শক্তি ও সাহসের প্রতীক হিসেবে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

মেরিলিন মনরো ও রুবি রেড

গত শতকের তুমুল জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল মেরিলিন মনরো। সেই সময় তো বটেই, এখও অনেকের কাছেই মনরো হলিউডের সেরা সেক্সসিম্বল। মনরোরও তার লালচে ঠোঁটের জন্য পরিচিত ছিলেন। যৌন আবেদনময়ী পোশাক, হাই-হিলের পাশাপাশি লাল লিপস্টিক তার কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ বা তারচেয়ে বেশি।

তার অভিনীত চরিত্রকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলত লাল লিপস্টিক। 'জেন্টেলম্যান প্রেফার ব্লন্ডস' ও 'চেরি ইন বাসস্টপ'-এর মতো চলচ্চিত্রে তার নারীত্ব প্রকাশ ও যৌন আবেদনময়তা ফুটিয়ে তুলতে আদর্শ উপাদান ছিল লাল লিপস্টিক।

চলচ্চিত্রের জন্য মনরোর লিপস্টিক ব্যবহার করা হতো অতি যত্নের সঙ্গে। তার মেকআপ আর্টিস্ট অ্যালান হোয়াইট স্নাইডার, তার ঠোঁট রাঙাতে গাঢ় এবং হালকা রঙের বিভিন্ন শেড ব্যবহার করতেন। সিনেমার বাইরে মনরোর প্রিয় লিপস্টিক ছিল ম্যাক্স ফ্যাক্টর কোম্পানির রুবি রেড। এই ব্র্যান্ড এখনো মার্কিন মুল্লুক ও ইউরোপে তুমুল জনপ্রিয়। মেরিলিন মনরোর নামে ২০১৬ সালে লাল রঙের চারটি ভিন্ন ভিন্ন শেডের লিপস্টিক বের কোম্পানিটি। যেখানে একটি শেড ছিল রুবি রেড।

লিপস্টিক যুদ্ধ

১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে লিপস্টিক বিশাল এক ব্যবসায় পরিণত হয়। প্রসাধনী ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের তীব্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। এলিজাবেথ অরডেন এবং হেলেন রুবিনস্টাইন ছিল তখন নেতস্থানীয়, তাদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে রেভলন। তারা তখন লিপস্টিকের পাশাপাশি নেইলপলিশও যোগ করেছে। রেভলনের ফায়ার অ্যান্ড আইস নামের শেড তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে।

মডেল ডোরিয়ান লেইককেকে দিয়ে উত্তেজক নয় এক মার্জিত বিজ্ঞাপন তৈরি করে কোম্পানিটি, সঙ্গে কিছু সাধারণ প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, তার একটি ছিল–'আপনি কি চুম্বনের সময় চোখ বন্ধ রাখেন?'

সেই যুগের আরেক অন্যতম প্রসাধনী উদ্যোক্তা ছিলেন হ্যাজেল বিশপ। রসায়ন নিয়ে পড়ালেখা করা বিশপ নিজস্ব ফর্মুলা ব্যবহার করে এমন লিপস্টিক তৈরি করেন, যা শুকাবে না এবং চুম্বনে মুছে যাবে না। তিনি প্রাথমিকভাবে ৬টি রঙের লিপস্টিক বাজারে আনেন, যেখানে পাঁচটি ছিল লাল কিংবা লালচে। বিশপ নো-স্মিয়ার– দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হবে এমন লিপস্টিক বাজারে আনেন প্রথম।

হেলেনা রুবিনস্টাইন এবং এলিজাবেথ অরডেনের মতো অনেক মেকআপ ব্র্যান্ড টেলিভিশনকে লিপস্টিক প্রচারণার ক্ষেত্র হিসেবে প্রত্যাখ্যান করলেও বিশপ এই গণমাধ্যমকে কাজে লাগান এবং বিপুল সাফল্য পান।

তবে ব্র্যান্ডটির টেলিভিশন বিজ্ঞাপন বিশেষ পরিশীলিত ছিল না, কিন্তু দর্শকদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। যেমন জনপ্রিয় টিভি শো বিট দ্য ক্লকে হ্যাজেল বিশপের বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়, এক মডেল তার হাতের তালুতে দুটো লিপস্টিক লাগাচ্ছে। তার একটি বিশপের, আরেকটি অন্য কোনো অজ্ঞাত কোম্পানির। দেখা গেল, লিপস্টিকের দাগ মুছে ফেলার চেষ্টাকালে বিশপের লিপস্টিকের দাগ হাতে লেগেই থাকছে, অন্যটি সহজেই মুছে যাচ্ছে।

রেভলনের প্রতিষ্ঠাতা চার্লস রেভলন বিশপের সাফল্য দেখে দ্রুত টিভিতে ফিরে আসেন। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রেভলন জনপ্রিয় গেম শো 'দ্য ৳৬৪,০০০ কোয়েশ্চেন'-এর স্পন্সরশিপ নেয়, রেভলনের লোগো শো'র সেটে বসানো হয়। সেখানে রেভলনকে প্রসাধানীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা হয় এবং তা সফলও হয়। শো'র জনপ্রিয়াতার ছাপ পড়ে রেভলনের ওপরও, রেভলনের লিপস্টিকের বিক্রি বেড়ে যায়। এর মূল কারণ ছিল তখনও টিভি শোগুলোই ছিল পারিবারিক বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম।

বিপশ, রেভলন, রুবিনস্টেইন ও আরডেনের প্রতিযোগিতা 'লিপস্টিক ওয়ার' নামে পরিচিতি ইতিহাসে। সবাই তখন একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে মরিয়া ছিল। এখনো প্রসাধনীর বাজারে তুমুল প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু তা ১৯৫০-এর দশককে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

সৌন্দর্যের জন্য ভোগান্তি

প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা (অনেক সংস্কৃতিতে পুরুষেরাও) অজান্তে বিষাক্ত কিংবা ক্ষতিকর উপাদান দিয়ে 'লিপস্টিক' তৈরি করে ব্যবহার করেছে। ঠোঁট রাঙাতে সাধারণত সিসার ব্যবহার প্রচলিত ছিল দীর্ঘসময়। যেমন ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার উর শহরের রানি পু-আবি তার ঠোঁটে সীসা এবং চূর্ণ গৈরিক মাটির মিশ্রণ ব্যবহার করতেন। রানির মৃত্যুর জন্য এই 'লিপস্টিক' ব্যবহারকে দায়ী করা না হলেও তিনি অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন।

প্রাচীন মিসরীয়রাও তাদের ঠোঁটকে লাল করতে গেরুয়া রং ব্যবহার করত। তবে তাদের ঠোঁটের ওই রঙেও ক্ষতিকর উপাদান ছিল। যেমন ফুকাস-অ্যালগিন (একটি উদ্ভিদ রঞ্জক, যাতে পারদ বেশি থাকে), আয়োডিন এবং ব্রোমিন ম্যানাইট। এ ছাড়া সম্ভাব্য প্রাণঘাতী আরও কিছু উদ্ভিদও ব্যবহার করা হতো সে সময়ে।

মিসরীয়রা ঠোঁটের রঙে চকচকে ভাব আনতে কখনো কখনো মাছের আঁশও ব্যবহার করতো।

অনেক সভ্যতায় বহু শতাব্দী ধরে ঠোঁট রাঙাতে সিঁদুর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন চীনে কয়েক হাজার বছর আগে, মারকিউরিক সালফাইড নামে পরিচিত রঞ্জকটি বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত, পশুর চর্বি মিশিয়ে তৈরি করা হতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপেও ঠোঁটের রঙের একটি সাধারণ উপাদান ছিল সিঁদুর। তবে দুর্ভাগ্যবশত, পারদযুক্ত বিষাক্ত খনিজ উপাদান সেই সিঁদুরে মিশ্রিত ছিল। পারদ যে ক্ষতিকারক, তা তখন উন্মোচিত হলেও, খাওয়ার বিপদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত এসেছে মাত্র ৫০ বছর আগে।

আধুনিক লিপস্টিক ফর্মুলায় সিসা ও পারদ বাদ পড়েছে। ক্ষতিকারক উপাদান সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার থাকায় লিপস্টিক এখন অনেক বেশি নিরাপদ।

তবে এখনো এমন কিছু লিপস্টিকে কিছু উপাদান–পলিথিনের মতো প্লাস্টিক, প্রোপিলিন গ্লাইকল (একজাতীয় অ্যালকোহল) ব্যবহার হয়।

পশ্চিমা বিশ্বে গড়ে একজন নারী প্রায় চার থেকে নয় পাউন্ড লিপস্টিক খেয়ে ফেলেন তার জীবদ্দশায়। আধুনিক লিপস্টিকে ক্ষতিকর উপাদানের পরিবর্তে উপকারী উপাদানই যুক্ত করা হয়েছে যেমন; ময়েশ্চারাইজিং, ভিটামিন-ই এবং অ্যাভোকাডো তেল।

ধরন ও উপকরণ

লিপস্টিক তৈরির জন্য ব্যবহৃত মৌলিক উপাদানগুলো বহু শতাব্দী ধরে একই ছিল। যেমন তেল, রঞ্জক এবং মোমের মিশ্রণ। সময় যত গেছে প্রযুক্তি বছরের পর বছর ধরে এই রেসিপিটিকেই উন্নত করার চেষ্টা করে গেছে, তবে এখনো লিপস্টিকের অন্যতম উপকরণ এই মিশ্রণই। সঙ্গে সুগন্ধি ও কিছু ক্ষেত্রে কন্ডিশনারের প্রয়োগ যুক্ত হয়েছে। আর ফর্মুলাগুলো এখন কম শুষ্ক এবং দীর্ঘস্থায়ী।

আধুনিক লিপস্টিকের অগ্রদূত বলা হয় ডাক্তার আবু আল-কাসিমকে। যিনি আলবুকাসিস নামেও পরিচিত। প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি সহজে বহনযোগ্য এবং প্রয়োগযোগ্য করে 'লিপস্টিকের' একধরনের কাঠি তৈরি করেছিলেন। সেটিই আধুনিক লিপস্টিক তৈরির পথ তৈরি করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আলবুকাসিসের লেখা আল-তাসরিফ রচনা সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছিল। বহু শতাব্দী ধরে চিকিৎসকেরা তার এই বই ব্যবহার করেছে।

এ সময়ের নলের মতো লিপস্টিক আসে ১৮০০ শতকের শেষ দিকে। তার আগে গ্লাসের টিউবের মধ্যে রঙিন ক্রিমগুলো রাখা হতো। ড্রেসিং টেবিল এবং হাতব্যাগের জন্য সেগুলো উপযুক্ত ছিল না।

১৮৮৪ সালে সেই ধারায় পরিবর্তন আনে গুয়েরলেইন নামের এক কোম্পানি। এদের পণ্যটির নাম ছিল 'নে এম ওবলেস পাস'। এটিকেই আসলে লিপস্টিক বলে সম্বোধন করা যায়। সে পণ্যের প্যাকেজিং অবশ্য এখনকার বিপণন দোকানগুলোতে দেখতে পাওয়া লিপস্টিকের মতো ছিল না। লিপস্টিক তৈরির উপকরণেও পার্থক্য ছিল। সেটি তৈরি হয়েছিল মোম, তেল ও গাঢ় আঙুরের মিশ্রণের মাধ্যমে। ●

গ্রাফিক্স: ইজেল

মেরিলিন মনরো, এলিজাবেথ টেইলর ও রোজি দ্য রিভেটা।

লিপস্টিকের বাহার কত!

আতিক উল্লাহ

মৃত্যুচুম্বন

১৫৫৮ সাল থেকে ১৬০৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড শাসন করেছিলেন রানি প্রথম এলিজাবেথ। তিনি নিজের ঠোঁট সব সময় লালচে রাখতে মরিয়া ছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল এই রং শয়তান এবং অশুভ আত্মাদের থেকে রক্ষা করে।

রানির ঠোঁট লাল করার উপকরণটি তৈরি হতো কোচিনিয়াল নামের একটি কীটপতঙ্গ (লালচে রঙের জন্য), রং মিশ্রণে ব্যবহৃত অ্যারাবিক বাইন্ডার আঠা এবং ডুমুরের ভেতরের লাল রঙের অংশ নিয়ে।

তার মেকআপ উপকরণটি ছিল স্বতন্ত্র এবং সম্ভবত প্রাণঘাতীও। তিনি কালো খোলের আইলাইনার পরতেন। মসৃণ ত্বকে প্রচুর ভেনেশিয়ান সিরাপ ব্যবহার করতেন। এটি সে সময়ের এমন একটি প্রসাধনী, যা ভিনেগারের সাথে সাদা সিসা মিশিয়ে তৈরি করা হতো। পরে বলা হয়েছে, এই সিসা বিষক্রিয়ার কারণ হতে পারে এবং ত্বক ও চুলেরও ক্ষতি করে। বিভিন্ন চিত্রকর্মে রানির চেহারা দেখেই তার রূপচর্চার ইতিহাস অনুধাবন করার চেষ্টা হয়েছে।

সে সময় মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল কম। তাই রানির ৬৯ বছর বেঁচে থাকাকে তখন অনেকের কাছে দীর্ঘই মনে হয়েছে। রানির মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না; তিনি মারা গিয়েছিলেন বিষক্রিয়ায়। আর এতে এই অনুমান করা হয়েছে যে কয়েক দশক ধরে তার ব্যবহার করে যাওয়া বিষাক্ত প্রসাধনীই এই মৃত্যুতে ভূমিকা রেখেছে। মৃত্যুকালেও তার ঠোঁটে রঙের ঘন স্তর অস্তিত্ব ছিল–অনেকের মতে এই রঙের প্রলেপ তৈরি হয়েছিল ঠোঁটে অনবরত প্রসাধনীর ব্যবহার থেকেই।

এলিজাবেথ টেইলর ও লাল লিপস্টিক

১৯৫০-এর দশকে, ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে 'জায়ান্ট', 'আ প্লেস ইন দ্য সান' এবং 'সাডেনলি লাস্ট সামার'-এর মতো চলচ্চিত্রে এলিজাবেথ টেইলর হাজির হয়েছেন চেরি রেড লিপস্টিক ঠোঁটে মেখে। তার চরিত্রের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছিল এই চেরি রেড লিপস্টিক। মনে করা হতো বাড়াবাড়ি রকমের গয়না, রেশমি কাপড়ের কাঁধখোলা পোশাকের টেইলরের লাল ঠোঁট তীব্র কামনার পাশাপাশি তার অপরূপ সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলত। এটি তার খ্যাতি, সাফল্য এবং সম্পদেরও বহিঃপ্রকাশ ছিল।

লিপস্টিকের রংটি টেইলরের বেগুনি চোখ, ফ্যাকাশে ত্বক এবং ঘন কালো চুলের সঙ্গে মানানসই ছিল। 'ক্যাট ইন আ হট টিন রুফ'-এর ম্যাগি পোলিটের মতো চরিত্রে তিনি সাধারণত এই লিপস্টিকই ব্যবহার করেছেন।

তবে সময়ের সাথে সাথে টেইলর এক পর্যায়ে তার ফ্যাশনে পরিবর্তন আনেন এবং লাল লিপস্টিক পরা কমিয়ে দেন। ১৯৬০-এর দশকে ঠোঁটকে প্রাকৃতিকভাবে রাখার ট্রেন্ডের কারণে তিনি লাল রং পরিত্যাগ করেন। যেমন ১৯৬৩ সালের 'দ্য ভিআইপি'তে তিনি ক্রিমি গোলাপি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু টেইলর লাল রঙের আকর্ষণীয় শক্তি ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ১৯৮৩ সালের টিভি সিরিজ 'বিটইউন ফ্রেন্ডস'-এ যেমন বাকি অভিনেত্রীদের কেবল নুড-টোনড অর্থাৎ কম তীব্র এমন লিপস্টিক দিতে বলা হয়েছিল, যাতে টেইলরকে কেউ ছাপিয়ে যেতে না পারে।

সেটে এক মেকআপ আর্টিস্ট এক অভিনেত্রীকে লাল লিপস্টিক লাগিয়ে দিলে তাকে তিরস্কার করা হয়: 'এলিজাবেথ ছাড়া আর কেউ লাল পরতে পারবে না'।

প্রাণোচ্ছলতা, সাহসিকতা ও শক্তির প্রতীক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানবেতর জীবনযাপন ও রেশন নিয়ে দ্বন্দ্বে মিত্রদেশগুলোর নারীরা অবাধ্যতার চিহ্ন হিসেবে লাল লিপস্টিক পরতেন। অনেক নারীই অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যুদ্ধের সময় ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষরা করতো এমন কাজও করেছেন। তাই অবাধ্যতার পাশাপাশি এটি ছিল তাদের প্রাণোচ্ছলতা, সাহসিকতা, সৌহার্দ্য এবং শক্তির প্রতীক।

ঘটনাক্রমে অ্যাডলফ হিটলার লাল লিপস্টিক ঘৃণা করতেন। তার কাছে কোনো প্রসাধনীর পরিবর্তে সাধারণ চেহারাই ছিল প্রিয়। তার কাছে লাল লিপস্টিক ব্যবহার ছিল অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ। পাশাপাশি হিটলার একজন কট্টর নিরামিষাশী ছিলে, ফলে সে সময় ঠোঁটে ব্যবহার করা প্রসাধনীতে ব্যবহার হওয়া পশুর চর্বি নিয়েও তার আপত্তি ছিল।

যুদ্ধের সময় রেশন হিসেবে খাদ্য, গ্যাস, টিনসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হতো সঙ্গে প্রসাধনী, বিশেষ করে রঙিন লিপস্টিক তখন নারীদের মনোবল বৃদ্ধির শক্তি ও আত্মসম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই রেশনে লিপস্টিক দেওয়ারও দাবি ছিল। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং ব্রিটিশ সরকার এই দৃষ্টিকোণকে সমর্থন দিলেও লিপস্টিককে রেশনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি শেষ পর্যন্ত। সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ ভোগ ম্যাগাজিনকে বলেছিলেন, পুরুষের কাছে তামাক যতটা অপরিহার্য, নারীর কাছে লিপস্টিক ততটাই অপরিহার্য।

তারপরও যুদ্ধের সময় পণ্যটির ওপর উচ্চ কর আরোপ করা হয়। ফলে লিপস্টিকের দাম বেড়ে যায়। তখন অনেক নারী ঠোঁট রাঙাতে সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে বিটরুটের জুসের ওপর নির্ভর করতে থাকেন।

রোজি দ্য রিভেটা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নারীরা এমন সব কাজে যোগ দেন, যা তারা আগে কখনো করেননি। পুরুষদের শূন্যস্থান পূরণে অনেকে তখন কারখানা, এমনকি যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অস্ত্র তৈরির কাজেও যোগ দিয়েছিলেন।

এসব কঠিন কাজের সময় ভারী জুতা পরিহিত, বেঁধে রাখা চুল, উজ্জ্বল লাল লিপস্টিক পরা যুদ্ধকর্মী রোজি দ্য রিভেটারের চরিত্র শিল্পমাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। চরিত্রটি অনুপ্রাণিত ছিল রোজালিন্ড পি ওয়াল্টার নামের এক যুদ্ধকর্মীর কাছ থেকে। যিনি কানেকটিকাটের স্ট্রাটফোর্ডের ভট এয়ারক্রাফট কোম্পানিতে কর্সেয়ার ফাইটার প্লেনে রিভেটার হিসেবে কাজ করতেন। রোজালিন্ডের কাজ নিয়ে এক সংবাদপত্র নিবন্ধ প্রকাশ করার পর গীতিকার রেড ইভান্স এবং জন জ্যাকব লোয়েব 'রোজি দ্য রিভেটার' গানটি লিখেন। এবং এই গানটি প্রচারিত হওয়ার পর রোজি দ্য রিভেটার রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান।

১৯৪৩ সালে 'স্যাটারডে ইভিনিং পোস্ট'-এর প্রচ্ছদে হয় নরম্যান রকওয়েলের আঁকা রোজি দ্য রিভেটার চিত্রকর্ম দিয়ে ।

এই একই সময়ে রোজির মতো বিখ্যাত হয়ে যায় এক পোস্টারের কল্যাণে। *এরপর পৃষ্ঠা ১৫*